POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا
فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ
وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

এবং যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা হইলে উহা তাহার নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না, এবং পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(আলে ইমরান: ৮৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 35

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 29 Aug, 2024 23 সফর 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

কেউ যখন কোন হিবা বা উপহার দেওয়ার অঙ্গীকার করে এবং তা পূর্ণ করার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে

২৫৯৮) হযরত জাবির (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) আমাকে বলতেন: যদি বাহারীন থেকে সম্পদ আসে তবে তোমাকে এই এই সম্পদ দিব। তিনি একথা তিন বার বলেন। সেই সম্পদ যখন আসে তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যু হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) একজন ঘোষণাকারীকে আদেশ দিলে সে ঘোষণা করল যে, নবী (সা.) এর পক্ষ থেকে যদি কারো সঙ্গে কোন অঙ্গীকার বা ঋণ থেকে থাকে তবে সে ব্যক্তি চাইলে আমার কাছে আসুক। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, নবী (সা.) আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে, হযরত আবু বকর আমাকে তিন ধামা ভর্তি করে (সম্পদ) দেন।

ডানদিকে থাকা ব্যক্তির গুরুত্ব

২৬০২) হযরত সাহাল বিন সাআদ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) এর নিকট কোন পানীয় দ্রব্য নিয়ে আসা হয়। তিনি (সা.) সেটা পান করেন। তাঁর ডান দিকে একটি ছেলে বসে ছিল আর তাঁর বাম দিকে প্রবীণ সাহাবাগণ। তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি আমাকে অনুমতি দাও যাতে আমি তাদেরকে দিতে পারি। সে বলল: হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! আপনার থেকে যে অংশ আমি পেয়েছি তা আমি অন্য কাউকে দিতে চাই না।' একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) সেই ছেলেটির হাতে পেয়ালাটি তুলে দেন।

(বুখারী, কিতাবুল হিবা)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১২ই জুলাই ২০২৪
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

স্মরণ রেখো, যে ব্যক্তি নামাযে আনন্দ অনুভব করে না, সে ঈমানের আনন্দ উপভোগ করে নি। নামায কেবল মাথা ঠোকার নাম নয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

নামাযের মধ্যে দোয়া ও অনুনয় বিনয়

একজন মানুষ ধার্মিক কি না সেটা নির্ণয় করার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল নামায। যে ব্যক্তি খোদার সামনে নামাযে আহাজারি করে, সে শান্তিতে থাকে। যেমন এক শিশু মাতৃক্রোড়ে চিৎকার করে কাঁদে আর মায়ের মমতা ও ভালবাসা অনুভব করে, ঠিক তদ্রুপে নামাযে অনুনয় বিনয় ও আবেগ সহকারে কাঁদে, সে নিজের জন্য দয়ালু প্রভু প্রতিপালকের ক্রোড়ে স্থান পায়। স্মরণ রেখো, যে ব্যক্তি নামাযে আনন্দ অনুভব করে না, সে ঈমানের আনন্দ উপভোগ করে নি। নামায কেবল মাথা ঠোকার নাম নয়। অনেকে মুরগীর ন্যায় চারবার মাথা ঠুকেই নামায শেষ করে ফেলে এবং পরে দীর্ঘ দোয়া শুরু করে। অথচ আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আবেদন করার যে সময়টুকু সে পেয়েছিল, সেটাকে কেবল প্রথা ও অভ্যাস হিসেবে দ্রুত শেষ করতে চেয়েছে আর আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বেরিয়ে এসে দোয়া প্রার্থনা করে। নামাযে দোয়া প্রার্থনা কর। নামাযকে দোয়ার একটি মাধ্যম মনে কর।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮)

তওদীদের বিপরীতে শিরক করার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে উঁচ্চ স্থান থেকে পতিত হয় এবং টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং সেই টুকরোগুলি দূর দূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জের ৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

তওদীদের বিপরীতে শিরক করার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে উঁচ্চ স্থান থেকে পতিত হয় এবং টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং সেই টুকরোগুলি দূর দূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কেননা মুশরিক নিজের জন্য একাধিক প্রভুর সন্ধান করে আর প্রত্যেক প্রভুকে তার মাংসের উপর অধিকার আছে।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, শিরক এর বিষয়টি কোন সহজ সরল বিষয় নয়, যেমনটি মনে করা হয়ে থাকে। বরং এটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি বিষয়। এই কারণেই অধিকাংশ জাতি বাহ্যত শিরক বিরোধী মনে হলেও কার্যত তাদেরকে শিরকে লিপ্ত পাওয়া যায়। আর এর কারণ এটাই যে, তারা শিরকের তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুত শিরকের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। বরং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যধির তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে। যতক্ষণ একে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার আওতায় আনার চেষ্টা করা হবে ততক্ষণ এটা অমীমাংসিতই থেকে যাবে। আমার মতে শিরক চার প্রকারের।

১) এমনটি ধারণা করা যে একাধিক সত্তা রয়েছে যারা সমান শক্তির অধিকারী আর তারা সকলেই জগতের প্রভু ও নেতা। এটা সত্তার সঙ্গে শিরক।

২) এমনটি ধারণা করা যে, চিন্তাশীল সত্তার সংখ্যা একাধিক, যাদের মধ্যে ঔৎকর্ষ বিভাজিত হয়ে আছে, প্রত্যেকের মাঝে কোনও একটি গুণ উৎকর্ষতা পেয়েছে। এটাও সত্তার সঙ্গে শিরক এর অন্তর্ভুক্ত।

৩) সেই সব কর্ম যা বিভিন্ন জাতির মাঝে বিনয় অবলম্বনের জন্য অবলম্বন করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে যেটিকে পরম বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হয়, সেটি খোদা ছাড়া অন্য কারো জন্য অবলম্বন করা। যেমন সিজদা পরম শিষ্টাচার এবং বিনয়ের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। অতএব, এই কাজটি কেবল খোদার জন্য বৈধ,অন্য কারো জন্য নয়।কিন্তু সিজদা ছাড়াও বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন দৈহিক গতিবিধি পরম বিনয় প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।যেমন করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা, অথবা নতজানু হওয়া। এই সমস্ত বিষয়কে খোদা তা'লা ইবাদতে ইলাহির অংশ বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব এখন এই কাজগুলি অন্য কারোর জন্য বৈধ নয়।

৪)চতুর্থ প্রকারের শিরক হল বাহ্যিক উপায় উপকরণ সম্পর্কে মানুষের এমন ধারণা করা যে, সেগুলির দ্বারা তার সকল চাহিদা পূর্ণ হবে আর সে আল্লাহ্ তা'লার অলৌকিক ক্ষমতার কথা মন থেকে সরিয়ে দেওয়া আর এমনটি চিন্তা করা যে, জাগতিক উপায় উপকরণই তার সকল চাহিদা পূরণ করবে। এটাও শিরক। তবে যদি এমন চিন্তা করে যে, এই সকল উপকরণে খোদা তা'লা অমুক শক্তি নিহিত রেখেছেন এবং তার উদ্দেশ্য অনুসারে পরিণাম বের হয় তবে সেটা শিরক হবে না।

৫) পঞ্চম প্রকারের শিরক হল খোদা তা'লার সেই সকল বিশেষ গুণাবলী যা তিনি বান্দাকে দেন নি, সেই সকল গুণাবলীতে কাউকে খোদার সমকক্ষ বানানো। যেমন- মৃতকে জীবিত করা, কোন নতুন বস্তু সৃষ্টি করা, খোদা তা'লার আদি ও অনাদি হওয়া, তাঁর অবিনশ্বর হওয়া ইত্যাদি এমন সব বিষয়, যেগুলিতে খোদার সমকক্ষ কাউকে দাঁড় করালে সেটা শিরক বলে বিবেচিত হবে। এমনকি যদি এই বিশ্বাসও পোষণ করা হয় যে, খোদা তা'লা স্বেচ্ছায় এবং নিজের নির্দেশে এই গুণাবলী বা এর কিছু অংশ বিশেষ কোন ব্যক্তিকে দিয়েছেন, তবে সেটাও শিরক হিসেবেই গণ্য হবে।

৭) সপ্তম প্রকারের শিরক হল এমন ধারণা পোষণ করা যে, খোদা তা'লা কোন বান্দাকে এতটাই ভালবাসেন যে, তিনি তার প্রতিটি কথা মেনে নেন। কেননা, এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সেই বান্দা ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৩)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বেলজিয়ামের জলসা সালানায় হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যারা পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য তৈরী করা প্রতিকুল অবস্থার কারণে এখানে এসেছেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে খুব কমই এমন আছেন বা হয়তো দুএকজন এমন আছেন যাদেরকে সরাসরি কোন প্রকার দুঃখের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়েছে। পাকিস্তানে এই ভীতি অবশ্যই আছে যে, আমাদের স্বামী, সন্তান ও নিকটাত্মীয়রা বিপদের মধ্যে আছেন। কোন উন্নাসিক তথাকথিত মৌলবীর প্ররোচনায় যে কোন মূহুর্তে ক্ষতি করে বসতে পারে। পাকিস্তানে বসবাসরত প্রত্যেক আহমদীর মাথার উপর এই ভীতি, উদ্বেগের এই তরবারি সব সময় ঝুলছে। কিন্তু এটিও বাস্তব যে, সাধারণত মহিলা ও স্বল্পবয়স্করা সেই কঠোর পরিস্থিতির কথা ভুলে যায়। প্রায় দেখা গেছে যে, এখানে জন্মগ্রহণ করা ছেলেমেয়েরা বা যারা দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করছে, তারা পাকিস্তানে আহমদীদের উপর হওয়া কঠোরতার কথা ভুলে গেছে। আর যাদের প্রিয়জনেরা সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারা তো জানতেও পারে না বা সেই বেদনা অনুভবও করে না যা তাদের প্রিয়জনেদের থাকাকালীন অনুভুত হতে পারত যে পাকিস্তানে কিছু কিছু স্থানে কিরূপ কঠোরতা রয়েছে। পাকিস্তানে আইনের কারণে আহমদীদের প্রতি এমন কঠোর আচরণ অব্যাহত রয়েছে। মৌলবী এবং জামাতের বিরুদ্ধবাদীদেরকে অবাধ অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তান ছাড়াও কিছু অন্যান্য দেশেও যেখানে আহমদীদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনুরূপভাবে এখানে অনেকে কিছু স্বল্পোন্নত দেশ থেকেও এসেছে। তাদের আসার কারণ হল, তাদের স্বামীরা এজন্য এখানে বদলি হয়ে এসেছেন যাতে অধিক আয়ের সুযোগ হয়। যাইহোক যে পরিস্থিতির কারণেই অধিকাংশ মানুষ এখানে এসেছে তারা পরিস্থিতির কারণে আসতে বাধ্য হয়েছে বা অধিক আয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে এসেছে বা প্রতিকুল পরিস্থিতির কারণে। সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, উভয় পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা যিনি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের প্রতি কৃপা করেছেন এবং জাগতিক উন্নতির জন্য যে উপকরণ সৃষ্টি করেছেন সেগুলির কারণে আল্লাহ্ সম্পর্কে কখনো উদাসীন হবেন না। সেগুলি যদি স্মরণে রাখেন তবে জগত তো পেয়েই যাবেন, এর পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার অফুরন্ত কৃপারাজি থেকেও অংশ পাবেন। এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে কিছু মহিলা ও তার পরিবার কষ্টের মধ্যে পড়ে এই সব দেশে এসেছে আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর অনেক কৃপা করেছেন। কিন্তু আবার অনেকে এমনও রয়েছেন যারা কঠিন পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও দেশেই থেকেছেন, আর সেখানেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কৃপা করেছেন। তারা কঠিন পরিস্থিতির সামনে বুক চিতিয়ে লড়াইও করেছেন। পাকিস্তান ছাড়াও কিছু অন্য দেশও আছে যেখানে অত্যাচার নির্যাতন হয়। আর অবশেষে সেদেশে থাকা সত্ত্বেও তারা সফলতার মুখ দেখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি কিছু এমন ঘটনা উপস্থাপন করব যা পাকিস্তানের নয়, অন্য দেশের। যাতে আপনারা যারা এখানে এসেছেন, যাদের মধ্যে স্বল্প বয়স্ক, যুবতী সকলেই রয়েছেন এবং দীর্ঘকাল এখানে অতিবাহিত করেছেন আর তারাও রয়েছেন যারা দীর্ঘকাল এখানে থাকার কারণে অনুভবও করে না যে কঠোরতা কি জিনিস- তারাও যেন জানতে পারে এবং তাদের ঈমান বৃদ্ধি ঘটে। তাদের নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন এবং ধর্মকে জাগতকিতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং এবং এ বিষয়ে চেতনা সৃষ্টি হয়।

প্রথম ঘটনাটি হল পাকিস্তানের এক মহিলার যিনি কঠোরতার সম্মুখীন হওয়ার পর কানাডা আসেন। তার উপর সরাসরি কঠোরতা আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলার তুলনায় পুরুষদেরকেই কঠোরতার সম্মুখীন হতে হয়েছে বা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেখানে সরাসরি কঠোরতা না থাকলেও তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছে। কিন্তু এই ভদ্রমহিলা সরাসরি প্রভাবিত হয়েছেন এবং তিনি কানাডা চলে এসেছেন। সেখানে তিনি আল্লাহ্ তা'লার বর্ধিত কৃপারাজিও দেখেছেন, কিন্তু নিজের পুরোনো দিনের কথা ভুলে যান নি। আনিসা সাহেবা নামে এই ভদ্রমহিলা লেখেন, পাকিস্তানে থাকাকালীন আমাদের পরিবারকে কাশ্মীর থেকে হিজরত করে ফয়সলাবাদ চলে আসতে হয়। হিজরতের কারণে আর্থিক পরিস্থিতি অনুকুল ছিল না। সেই সময় একটি প্রাইভেট হাসপাতালে হেড নার্স হিসেবে আমি খুব ভাল কাজ পেয়ে যাই। কিন্তু কিছুটা সময় পরে আমি জানতে পারলাম যে, সেই হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার ও ইনচার্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে গালি দিত। একদিন সে আমাকে নিজের অফিসে ডেকে কলেমা পড়তে বলে আর জানতে চায় যে তোমার কলেমা কি? আমি কলেমা শোনাই এবং বলি আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন অপশব্দ শুনতে প্রস্তুত নয় যা আপনি ব্যবহার করেন। একথা শুনে সে আমাকে কাদিয়ানি হওয়ার কারণে চাকরি থেকে বের করে দেয়।' এরপর তিনি কানাডা চলে আসেন। কানাডা আসার পর তার অবস্থাও ভাল হয়। ঈমানের এই দৃঢ়তা প্রত্যেক আহমদীকে প্রদর্শন করা উচিত এবং স্মরণ রাখা উচিত যে, ঈমানের এই দৃঢ়তাই আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে।

ফয়সালাবাদের সদর লাজনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)কে পত্রে লিখে একথার উল্লেখ করেছিলেন যে, হাসপাতালের ডাক্তার এভাবে বের করে দিয়েছে। খলীফা রাবে (রহ.) উত্তর দিয়েছিলেন যে, যে এমনটি করেছে তার হাসপাতাল ও ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছুকাল পর সেই হাসপাতালের মালিকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়ে সে ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং একদিক থেকে আল্লাহ্ তা'লা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন যার পরিণামে তার ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেল যে কি না হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে গালি দিত। এটি একটি নিদর্শন যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। যেরূপ আমি এইমাত্র উল্লেখ করলাম, পাকিস্তানের অবস্থা নিত্যদিনই তো আমাদের সামনে আসে আর এই কারণে অনেকে দেশ থেকে বেরিয়েও যাচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য দেশেও আহমদী মহিলারা যেভাবে কঠোরতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে তা তাদের এক অসাধারণ ত্যাগ-স্বীকারের নমুনা। এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে তারা নিজেদের ঈমানকে অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। এই দৃষ্টান্তগুলি আপনাদেরকে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্যদানকারী করে তোলা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বাংলাদেশের এক ভদ্রমহিলার ঘটনা এটি। বাংলাদেশের মানুষ সচরাচর কমই দেশের বাইরে গেছে। দুই একটি বা খুব নগণ্য সংখ্যক পরিবার ভিন দেশে গেছে। তারা সেভাবে আসেনি যেভাবে পাকিস্তানের মত অবস্থার কারণে এসেছে। যদিও সেখানেও অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিপদোন্মুখ আর সেখানেও মানুষ শহীদ হয়েছে। যাইহোক সিদ্দিকা সাহেবা নামে এক ভদ্রমহিলা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করছিলেন। তিনি ২০১১ সালে যুক্তরাজ্যে জলসা সালানার জন্য ছুটির আবেদন দিলে প্রবন্ধকরা তাঁকে প্রথমে ছুটি দিয়ে দেয়, কিন্তু পরে জানতে পারে এই ভদ্রমহিলা আহমদী আর খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য এবং জলসায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে, তখন প্রবন্ধকরা তাঁকে জানায় আপনাকে চাকরী থেকে পদত্যাগ করে যেতে হবে, আমরা ছুটি দিব না। একথা শুনে তিনি তৎক্ষণাত পদত্যাগ করেন এবং আমাকে পরে দোয়ার জন্য চিঠিও লেখেন। আমি তাঁকে একথাই লিখেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন আর পূর্বের চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করবেন। আমীর সাহেব লেখেন, আল্লাহ্ তা'লা এমন কৃপা করেছেন যে, দেশে চাকরী সন্ধান করতে গিয়ে অনেকে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়, কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা কেবল একটি স্থানেই হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর ইরফানা সাহেবা নামে এক ভদ্রমহিলার ঘটনা উল্লেখ করব যিনি সাহারামপুরের বাসিন্দা। তিনি নিজের স্বামীর এক ভয়াবহ ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, ২০০৮ সালে আহমদীয়াতের বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন ও বর্বরতা প্রদর্শিত হয়েছিল তা দেখলে গায়ে কাঁটা দিত। আমি এর সাক্ষী থেকেছি। ২০০৬ সালে আমরা আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারি। আমার স্বামীর কাপড়ের দোকান ছিল। প্রায় সময় দুপুরের দিকে তাঁর নতুন আহমদী সঙ্গী সেখানে এসে বসতেন, যিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে ভালভাবে জানতেন। তাদের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা এ সম্পর্কে আলোচনা হত, তর্ক বিতর্ক চলত। তিনি বলেন, আমার স্বামী জামাতে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। সেই সময় প্রায় আট বছর থেকে সাহারামপুরের জামাত ইসলামীর আমীর পদেও নিযুক্ত ছিলেন। এই কারণে তাদের মধ্যে অনেক বেশি তর্ক বিতর্ক হত। ২০০৬ সালে আমার বড় ছেলে কাদিয়ান গিয়ে সেখানে বয়আত করে নেয়। এরপর প্রায় এক বছর পর্যন্ত সে বয়আতের ঘটনা আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। যখন আমরা জানতে পারলাম যে যে সে আহমদী হয়ে গেছে, তখন আমার ছোট ছেলেও বয়আত করে নেয়। সে তাকেও চুপিসারে তবলীগ করছিল। এরপর আমার স্বামী ও কিছু আত্মীয় স্বজন কাদিয়ান যিয়ারতের পরিকল্পনা করেন। কাদিয়ান এসে তারা যা কিছু দেখেন এবং অনুভব করেন সে সম্পর্কে বলেন, কাদিয়ান সম্পর্কে যা কিছু আমাদের মৌলবী সাহেবরা বলতেন তা সম্পূর্ণ ভুল বলতেন। বরং আমরা ঠিক এর উল্টোটি দেখছি। সব কিছুই মিথ্যা ছিল, তাতে কোন সারবত্তা ছিল না। কাদিয়ান থেকে ফিরে এসে তিনি আমাদের সামনে কাদিয়ানের প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেন যা শুনে আমরা আশ্বস্ত হই। এরপর আমরা সকলে ২০০৮ সালের ২৭শে মে বয়আত করে নিই। এটি সেই দিন ছিল, যেদিন লাহোরে আমাদের দুটি মসজিদে নৃশংসভাবে আহমদীদের শহীদ করে দেয় আর সেই দিনই পুরো পরিবারকে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করেছেন।

এরপর তিনি বলেন, আশপাশের লোকেরা আমাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে। তাদের সন্দেহ হয় যে আমরা আহমদী হয়ে গেছি। সময় যত গড়াতে থাকে তাদের

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

জুমআর খুতবা

বনু মুস্তালিক এর পরিস্থিতি এবং ঘটনাবলীর বর্ণনা
মহরমের এই দিনগুলিতে দরূদ শরীফ ও দোয়া করার উপদেশ
বনু মুস্তালিক গোত্রের নেতা হারিস বিন আবি জারার তার জাতি ও এবং আরববাসীকে আঁ হযরত (সা.)–এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে এবং মদিনা থেকে প্রায় ছিয়ানব্বয় মাইল দূরত্বে একটি স্থানে সেনা সমাবেশ ঘটাতে শুরু করে।
বনু মুস্তালিক যুদ্ধের দিন মুসলমানদের সংকেত বাণী ছিল 'ইয়া মনসুর, আমিত, আমিত।
বর্তমানে আহমদীদেরকে দরূদ শরীফ পাঠ করার এবং এবং মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্য বিশেষ দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার প্রতিও আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ১২** জুলাই, **২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১২ ওফা, ১৪০৩ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ বিগত খুতবায় হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ হাদীস এবং ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।

সহীহ বুখারিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে যে মহানবী (সা.) যখন বনু মুস্তালিকের উপর আক্রমণ করেছিলেন তখন তারা অপ্রস্তুত ছিল। সেই সময় তারা পশুগুলিকে ঝর্ণার পানি খাওয়াচ্ছিল। আঁ হযরত (সা.) তাদের মধ্য থেকে যুদ্ধকারীদের হত্যা করেন আর তাদের সন্তানদের বন্দী বানিয়ে নেন। সেই দিনই খুয়াইরিয়া (রা.) তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) এই ঘটনা বলেছেন আর তিনি সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিলেন। (সহীহ বুখারী,কিতাবুল আতাক,হাদীস-২৫৪১)

ইতিহাসবিদ এবং জীবনীকারগণ বনু মুস্তালিকের উপর আক্রমণের ঘটনা বর্ণনা করে উভয় রেওয়াতেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে এমন প্রতীতি জন্মে যে বুখারীর হাদীসে বনু মুস্তালিক এর আক্রমণের বর্ণনাতে মতবিরোধ রয়েছে। কেননা বুখারীর বর্ণনা অনুসারে মুসলমানেরা তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় অতর্কিত আক্রমণ করেছিল। আর হাদীসের এই মতপার্থক্যের বিষয়টি হাদীস ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইবনে হিজরের সামনেও ছিল। যেমন আল্লামা বিন হিজর উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য করে লেখেন, এই বিষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে যে, যখন ইসলামী সেনা ঝর্ণার কাছে অকস্মাৎ তাদের ঘিরে ফেলে,তখন তারা কিছুক্ষণ লড়াই অবিচল ছিল। এরপর তারা সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধও করেছে। এই যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হয়েছে আর বনু মুস্তালিক পরাস্ত হয়েছে। (ফতহুল বারি,৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৭)

অর্থাৎ প্রথমে যখন আক্রমণ হয়, তখন তারা অপ্রস্তুত ছিল। যেমনটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরে তারা যুদ্ধের জন্য সংঘবদ্ধ হয় এবং উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ হয়। যেমনটি জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব উভয় ঘটনাকে সীরাত খাতামান্নবীঈন গ্রন্থে বর্ণনা দুটিকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করেছেন। তিনি জীবনীকার ও সহীহ বুখারীর রেওয়াতের উল্লেখ করে লেখেন–

" এ যুদ্ধের ব্যাপারে সহীহ্ বুখারিতেএকটি রেওয়ায়েত আছে যে, মহানবী (সা.) বনু মুস্তালিকের উপর এমন সময় আক্রমণ করেছিলেন যখন তারা অসতর্কভাবে নিজেদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছিল। কিন্তু ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে রেওয়ায়েতটি ঐতিহাসিকদের বর্ণনার পরিপন্থী নয়, প্রকৃতপক্ষে এই দুটি ঘটনা দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের। প্রকৃত ঘটনাটি হল, যখন ইসলামি বাহিনী বনু মুস্তালিকের নিকটবতী হয়, যদিও তারা অবশ্যই ইসলামি সেনাবাহিনীর আগমনের খবর পেয়েছিল, তবে তারা যে তাদের এত নিকটে পৌছে গিয়েছে এটা জানত না, ফলে তারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নিশ্চিন্তে পড়ে ছিল, বুখারির বর্ণনায় এই অবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যখন তাদেরকে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর আগমনের খবর দেওয়া হয়, তারা তৎক্ষণাৎ তাদের পূর্ব প্রস্তুতি অনুসারে সংঘবদ্ধ হয়ে যায় আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং এই অবস্থাই ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে হিজর এবং কতিপয় অন্যান্য গবেষকগণ এই মতানৈক্যের এই ব্যাখ্যাই করেছেন আর এটিই সঠিক বলে মনে হয়।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন,পৃ:৫৫৯)

এই যুদ্ধে মাত্র একজন সাহাবী হযরত হিশাম বিন সুবাবা শহীদ হন। তাঁর ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, কেবল একজন সাহাবী শহীদ হন এবং তাও ভুলবশত একজন মুসলিম তাকে কাফের ভেবে ভুল করে তাকে হত্যা করে। তাঁর নাম ছিল হযরত হিশাম বিন সুবাবা। হযরত অউস (রা.) নামে এক আনসার সাহাবা তাঁকে মুশরিক দলের বলে মনে করেন এবং ভলবশত তাঁকে শহীদ করে দেন। হিশাম(রা.) হযরত উবাদা বিন সামিত (রা.)– এর গোত্রের সদস্য ছিলেন। হিশাম বিন সুবাবার শাহাদতের ঘটনাটি ঠিক এইরূপ– তিনি শত্রুর সন্ধানে বের হয়েছিলেন। ফিরে আসার সময় ঝড় বইছিল আর ধুলোয় চারিদিক অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় তিনি আনসার সাহাবী হযরত অউসের মুখোমুখি হন।তিনি তাঁকে চিনতে পারেন নি। তিনি তাঁকে মুশরিক দলের সদস্য ভেবে বসেন এবং হিশাম (রা.)–এর উপর আক্রমণ করে তাঁকে শহীদ করে দেন।হিশামের ভাই সেই সময় মদিনায় অবস্থান করছিল, যার নাম হল মিকইয়াস বিন সুবাবা। সে মদিনা এসে ইসলাম গ্রহণ করে নেয় এবং নিজের ভাইয়ের হত্যার রক্তপণ দাবি করে, যা ভুলবশত হয়েছিল। আঁ হযরত (সা.) হিশাম এর ভাই মিকইয়াস বিন সুবাবাকে হযরত অউস (রা.) এর থেকে রক্তপণ পাইয়ে দেন। তাঁর ভাই মিকইয়াস সেই রক্তপণ গ্রহণ করে।কিন্তু রক্তপণ নেওয়ার পর মিকইয়াস হযরত অউস (রা.) ভাইয়ের মৃত্যুর কারণে হত্যা করে দেয় এবং ধর্মচ্যুত হয়ে কুরায়েশদের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রতীত হয় যে, সে পরিকল্পনা করে এসেছিল। তার এই প্রতারণামূলক আচরণ যা আরবের স্বীকৃত প্রথারও পরিপন্থী ছিল, আঁ হযরত (সা.) তার এই অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করেন। নুমাইলা নামে এক সাহাবী মক্কা বিজয়ের দিন মিকইয়াসকে হত্যা করেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ২৪৮) (কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪৮)

একথারও উল্লেখ পাওয়া যায় যে,এই যুদ্ধের সময় ফিরিশতাদের মাধ্যমেও সাহায্য লাভ হয়েছিল। উম্মুল মুমিনিন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) হযরত জুয়াইরা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের কাছে আসেসন। আমরা সেই সময় মুরাইসি'তে অবস্থান করছিলাম। আমি এই যুদ্ধের দিন আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, এত বড় সৈন্যদল এসেছে যে যার সাথে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি নেই। তিনি বলছেন যে আমি নিজে এত লোক, অস্ত্র এবং ঘোড়া দেখেছি যা আমি বর্ণনা করতে পারব না। জুয়াইরাহ (রা.) বলেন, যখন আমি ইসলাম কবুল করলাম এবং মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিবাহ করলেন এবং আমরা

ফিরে এলাম, তখন আমি দেখতে লাগলাম যে, আমার কাছে মুসলমানদের সংখ্যা আগের মত অতটা আর মনে হল না। অতঃপর আমি জানলাম যে, এটা আল্লাহ্‌তা'লার প্রতাপ ছিল যা তিনি মুশরিকদের অন্তরে রাখেন। বনু মুস্তালিক গোত্রের এক ব্যক্তি, যে পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, সে বলত, আমরা সাদা মৃতদের দেখেছি যারা 'আবলাক' অর্থাৎ সাদা রঙের ঘোড়ায় আরোহিত চিল। আমরা না তাদের পূর্বে কখনও দেখেছিলাম,না এর পরে দেখেছিলাম। (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া,৭ম খণ্ড, পৃ: ১৬৪-১৬৫)

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত উটের সংখ্যা ছিল দুই হাজার, ছাগলের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার এবং বন্দিদের সংখ্যা দুইশত পরিবার ছিল।(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৪৬)

কিছু ঐতিহাসিক আবার বন্দিদের সংখ্যা সাত'শতের অধিক বলে বর্ণনা করেছেন। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ:৩৭৯)

মহানবী (সা.) এসব বন্দিদের ওপর হযরত বারিদা (রা.) কে নেগরান (তত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের কাছে যে সমস্ত সম্পদ ও অস্ত্র-শস্ত্র ছিল সেগুলি একত্রিত করা হয়। পশুগুলিকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসা হয়। আঁ হযরত (সা.) হযরত শুকরান (রা.) পশুগুলির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। খুমস এবং মুসলমানদের অংশের জন্য হযরত মাহমিয়া বিন জাযাকে নিযুক্ত করেন। মহানবী (সা.) তা থেকে খুমস আহরণ করেন। খুমস হল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পঞ্চমাংশ, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এবং রসূলের নিকটাত্মীয়দের জন্য এবং সাধারণ ইসলামী প্রয়োজনের জন্য আলাদা করে রাখা হয়ে থাকে। বন্দীদেরকে সাধারণ মানুষের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হয় এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ও পশু ও ভেড়াগুলিকেও বিতরণ করে দেওয়া হয়।

(কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ১ম খণ্ড, পৃ:৪১০) (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ:৮৮)

হযরত জাওয়ায়ের (রা.) এর আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে বিবাহে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে, যেমনটি পূর্বে বর্ণনা করেছি।

'বনু মুস্তালিক গোত্রের যারা বন্দী হয়েছিল তাদের একজন ছিল সেই গোত্র প্রধান হারিস বিন আবু জারার -এর মেয়ে বাররা-ও ছিলেন ,আঁ হযরত (সা.) যার নাম পরিবর্তন করে জওয়াইরাহ রেখেছিলেন। বাররা মুসাফি বিন সাফওয়ানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, যে মুরাইসির যুদ্ধে নিহত হয়। সেই বন্দীদেরকে আঁ হযরত (সা.) নিয়মানুসারে মুসলমান সৈন্যদের মাঝে বিতরণ করে দিয়েছিলেন আর এই বিতরণের ফলে বাররা বিনতে হারিস এক আনসারী সাহাবী সাবিতবিন কায়েস এর হাতে অর্পিত হয়। বার্‌রা লিখিত চুক্তিপত্রের পদ্ধতিতে সাবিত বিন কায়সের সাথে একটি বোঝাপড়ায় এসেছিলেন। চুক্তি অনুসারে যদি একজন দাস বা দাসী তার মনিবের সাথে একটি চুক্তি করে যে যদি সে তার প্রভুকে এই পরিমাণ অর্থ মুক্তিপণ আদায় করে, এখানে উল্লেখ করা পরিমাণ ছিল নয় আউন্স স্বর্ণ, যা আসলে তিনশ ষাট দিরহাম হয়, তাহলে তাকে মুক্ত করা হবে।) এই চুক্তির পর, বার্‌রা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে সমস্ত পরিস্থিতি খুলে বললেন এবং এটা জানিয়ে যে তিনি বনু মুস্তালিক গোত্রের সর্দারের কন্যা, মুক্তিপণ দিতে তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করলেন। মহানবী (সা.) তার কথা শুনে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং সম্ভবত এটা ভেবে যে তিনি একজন খ্যাতনামা গোত্র প্রধানের কন্যা, তাই সেদিক থেকে তবলীগের সুবিধা হবে, তিনি (সা.) তাকে মুক্ত করে বিবাহ করতে মনস্থ করেন। তিনি (সা.) নিজে তাকে এই প্রস্তাব দেন এবং বার্‌রা'র সম্মতি দান করলে তিনি (সা.) তিনি (সা.) নিজের পক্ষ থেকে মুক্তিপণ পরিশোধ করেন এবং তাকে বিয়ে করেন।

সাহাবায়ে কেরাম যখন এটা দেখলেন, তখন তারা পছন্দ করলেন না যে, মহানবী (সা.) -এর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাদের হাতে বন্দী থাক, ফলে একশত পরিবার অর্থাৎ প্রায় শতাধিক বন্দী মুক্তিপণ না দিয়েই মুক্ত হলো। তাই হযরত আয়েশা বলতেন যে জুওয়াইরিয়া (রা.) তার সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত বরকতময় সত্তা প্রমাণিত হয়েছে।

এই আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং অনুগ্রহের পরিণামে বনু মুস্তালিক গোত্রের বহু মানুষ অচিরেই ইসলামের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে আঁ হযরত (সা.)এর প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হয়।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ:৫৭০-৫৭১)

একটি রেওয়াতে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে,হযরত জুওয়াইরাহ (রা.)-এর পিতা হযরত হারিস(রা.) মেয়ের মুক্তিপণ নিয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং মুক্তিপণ দিয়ে হযরত জুওয়াইরাহকে মুক্ত করার পর তিনি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এরপর নবী করীম (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

সীরাত ইবনে হিশাম এ বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) যখন বনু মুস্তালিক এর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন হযরত জুওয়াইরা (রা.)-এরপিতা হারিস বিন আবি জারার মেয়ের পুক্তিপণ নিয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। আকিক উপত্যকায় পৌঁছনোর পর তিনি মেয়ের জন্য মুক্তিপণ হিসেবে নিয়ে আসা উট দুটিকে আকিক উপত্যকার এক প্রান্তে লুকিয়ে রাখেন,যে উট দুটি তার খুব প্রিয় ছিল। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন। তিনি বললেন, হে মহম্মদ! (সা.) আপনি আমার কন্যাকে গ্রেপ্তার করেছেন। এটি তার মুক্তিপণ। আঁ হযরত (সা.) বললেন, সেই উট দুটি কোথায় যাদেরকে তুমি আকিক ঘাটিতে লুকিয়েছিলে? সে একথা শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হল। হারিস বললেন, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে , আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর আপনি আল্লাহ্ তা'লার রসুল। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ তা'লাই আপনাকে এ বিষয়ে অবগত করেছেন। কেননা সেই উটগুলির কাছে হারিস ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ছিল না। অতঃপর হারিস ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর দুই কন্যা এবং তাঁর জাতির কয়েকজন সদস্যও ইসলাম গ্রহণ করেন।

(আসসীরাতুন নববিয়্যহ,লি ইবনে হিশাম,পৃ: ৬৭৩-৬৭৪)

একটি রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে,হযরত জুওয়াইরাহ (রা.)-এর ভাই আব্দুর রহমান বিন হারিস তাঁর জাতি বনু মুস্তালিকের বন্দীদের জন্য মুক্তিপণ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু রাস্তায় তিনি উট এবং এক কৃষ্ণাঙ্গ দাসীকে একটি স্থানে লুকিয়ে দেন। এরপর আব্দুল্লাহ্ আঁ হযরত (সা.) এর কাছে এসে বন্দীদের মুক্তিপণের বিষয়ে কথা বলেন। আঁ হযরত (সা.) বলেন,হ্যাঁ ঠিক আছে,কিন্তু তুমি মুক্তিপণ হিসেবে কি নিয়ে এসেছ। তিনি বললেন,আমি কিছুই নিয়ে আসি নি। আঁ হযরত (সা.) বললেন, তবে সেই পূর্ণাঙ্গ উট ও কৃষ্ণাঙ্গ দাসী কোথায় যাদেরকে তুমি অমুক অমুক স্থানে লুকিয়ে রেখেছ। একথা শুনতেই আব্দুল্লাহ্ বললেন,আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ এক এবং মহম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসুল। সেই সময় আমার কাছে কেউ ছিল না যখন আমি মুক্তিপণের সম্পদগুলিকে লুকিয়েছিলাম আর সেই ঘটনার পর আমার পূর্বে আপনার কাছে অন্য কেউও পৌঁছয় নি। যাইহোক এরপর তিনি মুসলমান হয়ে যান।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিসল আসহাব, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২০)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকেও লিখেছেনযে,'হযরত জুওয়াইরাহ-এর বিবাহ সম্পর্কে একটি রেওয়াতে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পিতা যখন তাঁকে মুক্ত করার জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন,তখন তাঁর সহচার্যের কল্যাণে তিনি মুসলমান হয়ে যান আর আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব (বিবাহ প্রস্তাব) পাওয়ার ভক্তি ও ভালবাসা সহকারে আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন,পৃ: ৫৭১)

হযরত জুওয়াইরা (রা.) বর্ণনা করেন, হুযুর আকরম (সা.)-এর আগমণের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম (অর্থাৎ যখন তিনি বনু মুস্তালিক গোত্রের কাছে আসেন) ইয়াসরাব (মদিনা) থেকে চাঁদ উদিত হচ্ছে আর আমার কোলে এসে পড়েছে। আমি কাউকে নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করতে পছন্দ করি নি। এরই মাঝে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর আগমণ হয়।যখন আমাকে বন্দী বানিয়ে নেওয়া হয়, তখন আমার মাঝে সেই স্বপ্ন পূরণের আশা জেগে ওঠে। যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে মুক্ত করলেন এবং আমাকে বিবাহ করলেন, খোদার কসম, সেই সময় আমি তাঁকে নিজের জাতির সম্পর্কে কথা বলি নি। আমি আমার জাতির সদস্যদের মুক্তির বিষয়ে কোন সুপারিশ করি নি, এমনকি মুসলমানেরা নিজেরাই তাদেরকে মুক্তি দেয়। আমি এ বিষয়ে জানতে পারি নি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার এক ফুপাতো বোন আমাকে অবগত করে। আমি তখন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৩৪৭)

ইবনে হিশাম লেখেন, আঁ হযরত (সা.) হযরত জুওয়াইরাহ (রা.)-এর জন্য জন্য চারশ দিরহাম মোহরানা ধার্য করেন।

(আসসীরাতুন নববীয়্যা লি ইবনে হিশাম,পৃ: ৬৭৪)

যাইহোক মহানবী (সা.) এই অভিযান থেকে সফলকাম ও বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন এবং মোট ২৮ দিন মদীনার বাইরে অবস্থান করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৫৪)

এ অভিযান থেকে ফিরে আসার পর মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি ইবনে সুলুলের ভণ্ডামিও প্রকাশ পায়। ইতিহাসেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

এর বিস্তারিত বিবরণ হল, বনু মুস্তালিক এর যুদ্ধ শেষ হয় আর মুসলমানরা তখনও মুরাইসি কূপের কাছে অবস্থান করছিল। সেই কূপে পানির পরিমাণ অনেক কম ছিল। বালতি ফেলা হলে তা অর্ধেক ভর্তি হয়ে আসত। কূপের কাছে সিনান বিন ওয়াবার জুহনী আসে, যে বনু খাজরাজ গোত্রের মিত্র ছিল। সেই সময় পানির কাছে আনসার ও মুহাজিরগণ একত্রিত ছিল। সিনান বিন ওয়াবার জুহনি নিজের বালতি কূপের মধ্যে ফেলে আর একই সময়ে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর ভৃত্য জাহজাহ বিন মাসউদ গাফফারিও পানি উত্তোলনের জন্য কূপের মধ্যে বালতি ফেলে। সিনান ও জাহজাহ-র বালতিতে পরস্পর ঠোকাঠুকি হয়। যাতে তারা উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে

বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। পানি অপর্যাপ্ত ছিল তাই কেউই পুরো পানি পায় নি। জাহজাহ সিনানকে প্রহার করে আর সে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। সিনান সাহায্যের জন্য চিৎকার করে ডাকে হে আনসারগণ! অপরদিকে জাহজাহ মুহাজিরদেরকে চিৎকার করে ডাকে বলে হে মুহাজিরগণ! অপর এক রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, হে কুরায়েশগণ! এরফলে উভয় গোত্রের লোকেরা সেখানে একত্রিত হয় এবং অস্ত্র বের করে ফেলে। অনেক বড় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) অবিলম্বে ্ই ঘটনার সংবাদ পেয়ে যান এবং তিনি বিষয়টির সেখানেই নিস্পত্তি করেন। যাইহোক আরও কিছু রেওয়াতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

সহীহ বুখারীর একটি হাদীস অনুসারে বিবাদের কারণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে,মুহাজিরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আনসারদের এক ব্যক্তির পিছনে লাথি মারে। সেই আনসারী চিৎকার করে বলল, হে আনসারগণ! সাহায্যের জন্য এগিয়ে এস আর সেই মুহাজির বলল, হে মুহাজিরগণ! সাহায্যের এগিয়ে এস। তাদের উভয়ের মধ্যে ঝগড়ার কারণ ছিল জলাশয় নিয়ে, যেখান থেকে আনসারের উট পানি পান করেছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা.) সেখানে পৌঁছলে বললেন, এমন অজ্ঞতার চেঁচামেচি কেন? তোমরা কি নিয়ে কথা বলছ? এগুলি অজ্ঞদের কথাবার্তা। আঁ হযরত (সা.) কে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনানো হল। তিনি (সা.) বললেন, তোমরা এমন বিষয় ত্যাগ কর। এটা ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করে।প্রত্যেকের উচিত নিজ ভাইকে সাহায্য করা, সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত। যদি সে অত্যাচারী হয় তবে তাকে সেই অত্যাচার থেকে বাধা দাও আর অত্যচারিত হলে তাকে সাহায্য কর।

মুহাজিরদের একটি দল উবাদা বিন সামিত (রা.) এর সঙ্গে আলোচনা করে এবং আনসারদের একটি দল সিনান এর সঙ্গে আলোচনা করে। আলোচনার পর সিনান নিজের অধিকার ত্যাগ করে। আঁ হযরত (সা.) এই কথাগুলি তাদের কাছে পৌঁধে দেন। তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বোঝান,যার ফলে সিনান নিজের অধিকার ছেড়ে দেয়। আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার দশজন মুনাফিক সঙ্গীদের নিয়ে বসে ছিল।সেখানে হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.)ও ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন কম বয়স্ক ছিলেন। কিম্বা কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি তখনও সাবালকত্ব অর্জন করেন নি। আবার কিছু কিছু রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি সাবালক ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই হাজাজাহর চিৎকার শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। সে বলল, খোদার কসম। আমি আজকের ন্যায় দিন কখনও দেখি নি। খোদার কসম! আঁ হযরত (সা.)-এর মদিনা পদার্পণের দিন থেকেই এই ধর্ম আমার কাছে ভীষণ অপছন্দের ছিল। কিন্তু আমার জাতি আমার উপর প্রাধান্য লাভ করে আর তারা ইসলাম গ্রহণ করে। কুরায়েশদের লোকেরা আজ আমাদের শাসকের ভূমিকায় আর আমাদের শহরে তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং আমাদের অনুগ্রহের অবমূল্যায়ন করেছে। সে ভীষণ একট নোংরা উপমা টেনে বলল, কুরায়েশরা এমন এক জাতি,যেমনটি কথিত আছে, যারা নিজেদের কুকুরকে মোটাতাজা করে যাতে সে তোমাদেরকে খেয়ে ফেলে।আমার ধারণা ছিল, ভোবে হাজাজাহ আর্তনাদ করছিল, আমি এমন আর্তনাদ শোনার পূর্বেই আমি কেন মারা গেলাম না। আমি এখানে রয়েছি, আমার দ্বারা তো এসব কিছু সহ্য করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্র কসম! আমরা যদি মদিনায় পৌঁছে যাই তবে সব থেকে সম্মানিত ব্যক্তি সব থেকে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সেখান থেকে বের করে দিবে। অতঃপর সে সেখানে উপস্থিত স্বজাতির প্রতি সম্বোধন করে বলল, তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করেছ। তোমরা তাকে নিজেদের শহরে আশ্রয় দিয়েছ আর সে সেখানেই থেকে গেছে। তোমরা নিজেদের সম্পদ থেকে তাদেরকে অংশ নির্ধারণ করেছ,যার ফলে তারা সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। খোদার কসম! এখনও যদি তোমরা নিজেদের সংযত কর, তবে দেখবে, তারা তোমাদের শহর ছেড়ে অন্য কোন শহরে চলে যাবে। তোমরা যা কিছু তাদের জন্য করেছিলে, এরা তাতেও সন্তুষ্ট হয়নি। সে অনেক প্রকারে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, তোমরা তাদের প্রতি যতটা অনুগ্রহ করেছ, তারা তাতেও সন্তুষ্ট হয়নি, এমনকি তোমরা নিজেদের প্রাণকে মৃত্যুর লক্ষ্য স্থলে পরিণত করেছ। তোমরা এর জন্য (অর্থাৎ মহম্মদের জন্য) নিহত হয়েছ এবং নিজেদের সন্তানদের অনাথ করেছ। যার পরিণামে তোমাদের সংখ্যা হ্রাস হয়েছে আর তাদের সংখ্যাধিক্য হয়েছে। হযরত যায়েদ বিন আরকাম যখন এমন কথা শুনল যে,আমরা মদিনায় পৌঁছলে সবথেকে সম্মানীয় ব্যক্তি সব থেকে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে মদিনা থেকে বের করে দিবে- তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে তাকে বললেন, আল্লাহ্ কসম! তুমিই হলে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তুমিই নিকৃষ্ট আর মহম্মদ (সা.) রহমান খোদার পক্ষ থেকে বিজয় ও সম্মানের অধিকারী আর মুসলমানদের পক্ষ থেকে সব থেবে বেশি ক্ষমতাধর। তিনি নিজের আত্মাভিমান প্রকাশ করেন।

একথা শুনে ইবনে উবাই বলল, তুমি চুপ কর। আমি তো কেবল হাসিতামাশা ও রসিকতার ছলে এমন কথা বলছিলাম। সে ভীতও হয়েছিল। যায়েদ বিন আরকাম এই সমস্ত কথা শোনার পর তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন। সেই সময় তাঁর কাছে মুহাজির এবং আনসারদের একটি দলও মজুদ ছিল। যায়েদ আঁ হযরত (সা.) সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন। বুখারীর রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে,যায়েদ বিন আরকাম তার চাচাতো ভাইয়ের কাছে এই ঘটনার উল্লেখ করেন। আর তাঁর চাচা নবী (সা.) কে এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত করেন। মহানবী (সা.) অবিলম্বে যায়েদকে ডেকে পাঠান। মহানবী (সা.) যায়েদের কথা অপছন্দ করলেন, তাঁর চেহারার পাংশু বর্ণ ধারণ করল এবং বললেন, 'হে বালক! সম্ভবত আপনি আবদুল্লাহ্ ইবনে আবির উপর রাগান্বিত।' যায়েদ বললেন, না। হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহর কসম! এমনটি নয়। আমি নিজে একথা তার মুখ থেকে শুনেছি। আঁ হযরত (সা) বললেন, হয়তো তোমার হয়তো কোথাও শুনতে ভুল হয়েছে। যায়েদ বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম! এমনটি নয়। আঁ হযরত (সা.) বললেন,তোমার হয়তো কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে। যায়েদ বললেন,হে আল্লাহ্র রসুল! এমনটি নয়। সৈন্যদের মধ্যে ইবনে উবাইয়ের কথা ছড়িয়ে পড়ে। লোকের মুখে এই কথাটিই ঘুরতে থাকে আর আনসারদের লোকেরা যায়েদকে তিরস্কার করতে থাকে এবং তাকে সতর্ক করে বলতে থাকে যে, তুমি নিজ গোত্র প্রধানের উপর অপবাদ আরোপ করেছ। তুমি তার বিরুদ্ধে এমন কথা বলছ যা সে বলে নি। যায়েদের চাচাও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বললেন, তোমার কি মতিভ্রম হল? নবী (সা.) তোমাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যায়েদ বললেন, আল্লাহর কসম! যা কিছু সে বলেছে তা আমি নিজে শুনেছি। আল্লাহ্র কসম! খাজরাজ গোত্রে আমার কাছে আব্দুল্লাহ বিন উবাই থেকে প্রিয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। আমি এমন কথা নিজের পিতার মুখেও শুনতাম, যা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বলেছিল, তবুও তা রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে অবশ্যই জানাতাম। অমার তো কোন পরোয়া ছিল না। তার ঈমান অনেক দৃঢ় ছিল। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলতেন, তবে সে কথা আমি আঁ হযরত (সা.) কে অবশ্যই জানাতাম। আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-এর প্রতি ওহী নাযেল করবেন যা আমার কথার সত্যায়ন করবে। যায়েদ এমন পরিস্থিতিতে ভীষণভাবে মর্মাহত হন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে,এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই যা আমার কাছে অভুতপূর্ব ছিল।আমি নিজের বাড়িতে বসে থাকি। এখানে বাড়ি বলতে তাই বাইরের অবস্থান স্থল, যেখানে তিনি শিবির স্থাপন করেছিলেন। মদিনার বাড়ি নয়। কেননা এই সমস্ত ঘটনা মদিনার বাইরের। যায়েদ লোকের কথা এড়াতে তাদের সামনে আসা বন্ধ করে দিল। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, লোকে তাকে দেখে বলবে যে সে মিথ্যা বলেছে। অপরদিকে মজলিসে উপস্থিত আনসারগণ যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর নির্দেশ এবং যায়েদকে দেওয়া উত্তর শুনল,তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক সেখান থেকে উঠে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই কাছে গিয়ে তাকে বিষয়টি জানাল। আর অউস বিন খাওলি বলল,হে আবু হুবাব! (এটা তার ডাক নাম ছিল) যদি তুমি একথা বলে থাক তবে নবী করীম (সা.) কে গিয়ে বলে দাও, যাতে তিনি তোমার জন্য ইসতেগফার করতে পারেন আর তুমি একথা অস্বীকার করো না। পাছে তোমার সম্পর্কে কোন ওহী নাযেল হয়ে তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। যদি তুমি এমন কথা না বলে থাক তবে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে এসে তার অজুহাত বর্ণনা কর এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বল যে, তুমি এমনটি বল নি। তখন সে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলল যে, সে কিছুই বলে নি। এরপর ইবনে উবাই রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসে। রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বলেন, হে ইবনে উবাই! যদি তুমি এমন কথা বলে থাক তবে তওবা কর। সে তখন আল্লাহর নামে শপথ করে বলল, যায়েদ যা বলেছে তা আমি বলিনি।

অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, যখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই জানত পারল, তখন সে নিজে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হল। সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলল, যায়েদ যে কথা আপনাকে বলেছে তা আমি বলি নি। তৃতীয় এক হাদীসে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে,আঁ হযরত (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই ও তার সঙ্গীদের ডেকে পাঠালে, সে কসম খেয়ে বলে যে এই ধরণের কোন কথা সে বলে নি। একথা শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে আনসার সাহাবাগণ বললেন, ধারণা করা যেতে পরে ছেলের কথা বুঝতে ভুল হয়েছে এবং ইবনে উবাই এর কথা তার মনে নেই। একথা তারা ইবনে উবাইকে আড়াল করার জন্য বলল। কেননা, কেননা সে নিজ জাতির একজন সম্মানীয় ও মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিল। কারো কারো মনে হল যায়েদ সত্য কথা বলছে আবার কারো মনে সন্দেহ পোষণ করল। কারো কারো মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হল যে, যায়েদ কম বয়সী হলেও সে সত্য কথাই বলছে। তবে প্রবীণদের মধ্যে অধিকাংশই মনে করছিল যে, যায়েদের ভুল হচ্ছে।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন ইবনে উবাই এর ঘটনা ঘটে,তখন আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। আঁ হযরত (সা.) গাছের ছায়ায় বসে ছিলেন আর একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস তাঁর পিঠ মর্দন করছিল। আমি নিবেদন করলাম,হে রসুলুল্লাহ! আপনার হয়তো কোমর ব্যাথা করছে।আঁ হযরত (সা.) বললেন,গত রাতে উট আমাকে ফেলে দিয়েছিল।

এই সব কথার পর আমি আসল কথাটি পেড়ে বসলাম। আমি নিবেদন করলাম,হে আল্লাহ্র রসুল! (সা.) আমাকে অনুমতি দিন, আমি ইবনে উবাই এর ধড় থেকে গর্দান আলাদা করে দিই। তাকে হত্যা করব। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমি যদি সাহাবাদেরকে তাকে হত্যা করার আদেশ দিই তবে তারা তাকে হত্যা করে ফেলবে আর মদিনায় অনেকের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না।আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! (সা.) আপনি মহম্মদ বিন মাসলামাকে কে আদেশ দিন, সে তাকে হত্যা করবে। আঁ হযরত (সা.) বললেন,লোকে কি একথা বলে বেড়াবে না যে আমি নিজের সঙ্গীদেরকে হত্যা করছি। আমি নিবেদন করলাম, তবে আপনি লোকদের রওনা হওয়ার নির্দেশ দিন। তিনি (সা.) বললেন,বেশ ঠিক আছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) নিজে হযরত উমর (রা.)কে বললেন, রওনা হওয়ার ঘোষণা কর। এটা দিনের সেই সময় ছিল,যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) সচরাচর সফর করতেন না। আঁ হযরত (সা.) নিজেও এমনটা ধারণা করেন যে, সে অবশ্যই কোন কথা বলেছে আর সেটিকেই পুরো করার জন্য তিনি বললেন, বেশ। সে বলেছে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে বের করে দিবে।চলো যাত্রা করি। চলো মদিনা ফিরে দেখা যাবে সে কি করে। যাইহোক হযরত উমর (লা.) বর্ণনা করেন, আমি রওনা হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিই। সেই সময় ভীষণ গরম ছিল। আর আঁ হযরত (সা.)-এর রীতি ছিল বেলা জুড়ানোর সময় তিনি সফর করতেন। কিন্তু যখন ইবনে উবাই এর সংবাদ পেলেন, তখন সেই সময় রওনা হন এবং সর্বপ্রথম সাআদ বিন আবি উবাদা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং কারো কারো মতে তিনি সর্বপ্রথম উসায়েদ বিন হুফায়ের (রা.) এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন, আসসালামো আলাইকা আইয়োহান্নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। তখন নবী করীম (সা.) বললেন, 'ওয়া আলাইকাস সালামো ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। তারা নিবেদন করলেন, হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! আপনি এত গরমে এই সময় রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আপনার তো এত গরমে রওনা হওয়ার অভ্যাস নেই। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমাদের কাছে কি সেই কথা পৌঁছয়নি যা তোমাদের সাথী বলেছে? তারা জিজ্ঞাসা করল,হে আল্লাহ্র রসুল! কোন সঙ্গী? আঁ হযরত (সা.) বললেন,আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বলেছে, সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি মদীনায় ফিরে এসে সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে শহর থেকে বহিষ্কার করবে। এতে নিষ্ঠাবান আনসার সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি চাইলে তাকে মদিনা থেকে বের করে দিন। কেননা, প্রকৃতপক্ষে, আপনি সবচেয়ে সম্মানিত এবং সমস্ত সম্মান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রাপ্য এবং মোমেনীনদের জন্য। আপনি চাইলে তাকে শহর থেকে বের করে দিন এবং চাইলে তার সাথে নম্রতার আচরণ করুন। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে মদিনায় সেই সময় নিয়ে আসেন যখন তার জাতি তার জন্য গোত্র প্রধান হিসেবে অভিষেকের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে মদিনায় নিয়ে আসায় তার মনে হয়েছে যে,আপনি তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাব তফসীরুল কুরআন,হাদীস: ৪৯০৪,৪৯০৫) (হুদাস সারি মুকদ্দমা ফতহুল বারি, পৃ: ৪৬৮) (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩৮৯) (ফতহুল বারি শারাহ সহীহ আল বুখারী, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৬৪৫) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড,পৃ: ১৮২) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৪৮-৩৫০) (সুবুলুল হুদা, অনুবাদ, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৭৮২) (আসসীরাতুন নববিয়াহ, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৬৭০-৬৭১)

যাইহোক আঁ হযরত (সা.) বিশ্বাস করেছিলেন যে যায়েদ সত্য কথা বলেছে। আর আব্দুল্লাহ্ মিথ্যা বলছে। কিন্তু সেই সময় তিনি কৌশলগত কারণে নীরব থাকেন। তিনি বলেন মদিনা গিয়ে দেখা যাবে কে লাঞ্ছিত আর আর কে সম্মানীয়। কিন্তু যাইহোক অবশেষে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারই দোষ ছিল, সে একথা বলেছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই সম্পর্কে বিস্তারিত যা বলেছেন তা ভবিষ্যতে ব্যাখ্যা করা হবে। ইনশাআল্লাহ্।

এরপর হুযুর আনোয়ার বলেন, আগামী শুক্রবার ইনশাআল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের জলসা সালানাও শুরু হবে। তার জন্যও দোয়া করবেন।আল্লাহ্ সার্বিকভাবে কল্যানময় করুন। সকল কর্মীকে উচ্চ নৈতিকতা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন। যে সকল অতিথি এসেছেন এবং যারা সফরে আছেন তাদের সবাইকে নিরাপদে রাখুন। আমীন।

কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব এবং জানাযা পড়াব।

প্রথম জানাযা হল নাযের দাওয়াত-ই-ইলাল্লাহ্ উত্তর ভারত, মাননীয় হামিদ কাউসার সাহেবের সহধর্মিণী মোহতরমা সালিমা বানো সাহেবার। গত কয়েকদিন পূর্বে মারা গেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। মরহুমা মূসী ছিলেন। মহম্মদ হামীদ কাউসার সাহেব লেখেন, তিনি জম্মু কাশ্মীমের ভদরওয়া নিবাসী আব্দুল গনী সাহেবের কন্যা ছিলেন।তাঁর পিতা মৌলবী মহম্মদ হোসেন সাহেবের মাধ্যমে ১৯৩৫ সালে বয়আত করেছিলেন দেশ বিভাজন হওয়া পর্যন্ত তিনি পার্বত্য ও তুষারাবৃত পথে পায়ে হেঁটে এবং ঘোড়া গাড়িতে করে জলসা সালানার জন্য কাদিয়ানে পৌঁছে যেতেন। অনেক উদ্যমী ব্যক্তি ছিলেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ভাষণ শুনতেন। নিজের স্ত্রী সম্পর্কে লেখেন, আমরা ওয়াকফে জিন্দগীরা যেটুকু মাসহারা পেতাম, তা অত্যন্ত নগন্য ছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিমিত উপায়ে তিনি জীবন যাপন করতেন আর অতিথিদের সেবাও করতেন। তিনি বলতেন,আল্লাহ্ তা'লা এই মাসহারা মধ্যে প্রভূত আশিস দান করেছেন।অল্পে তুষ্টি তার এক অসাধারণ গুণ ছিল, কখনও অনুযোগ করতেন না। এটা সেই সব ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা যারা অনেক সময় অভিযোগ অনুযোগ করে। কাউসার সাহেব লেখেন, যেহেতু শ্রীনগরে প্রথম পোস্টিং হয়েছিল, সেখান থেকে মুম্বাইয়ে আমাকে স্থানন্তরিত করা হয়। সেখানে তিনি সদর লাজনা হিসেবে সেবাদানের সুযোগ পেয়েছেন। এরপর কাবাবির স্থানান্তর হয়। সেখানে তিনি আমাকে বলেন, আমার জন্য আরবী শেখা অনেক কঠিন। তাই মেয়েদের সঙ্গে কথোপকথনের জন্য চলতি আরবি শিখে নিই। এরপর সে চলতি আরবী খুব দ্রুত রপ্ত করে নেয় এবং তাদের শিক্ষা দীক্ষায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ৮৬ সাল থেকে ৯৭ সাল পর্যন্ত মোট এগারো বছর কাবাবীরের সদর লাজনা হিসেবে সেবা করেছেন। তিনি লাজনা ইমাউল্লাহ্ সংগঠনটিকে নতুনভাবে সংগঠিত করেন। সেখানে ইজতেমার আয়োজন হতে শুরু করে। ইজতেমা আয়োজিত হওয়ার কারণে সেই সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)ও তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন, কাবাবীরে লাজনা ইমাউল্লাহ্র ইজতেমা হচ্ছে আর এটা তাদের ৫ম ইজতেমা। লাজনা ইমাউল্লাহ্ কাবাবীর সমগ্র আরবের মহিলাদের নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন। তাদের মধ্যে কেবল একজনই আছেন যে ভারতের কাশ্মীর থেকে এসেছেন, কিন্তু তিনিও আরবদের মত হয়ে গেছেন। তিনি তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে তরবীয়ত করেছেন। ১৯৯৮ সালে আমি ফিরে এলে তিনিও আমার সাথে ভারতে চলে আসেন এবং যতদিন সুস্থ ছিলেন এবং পরিস্থিতি অনুমতি দিয়েছে, মরহুমা প্রায় প্রতিদিন বায়তুদদোয়া,মসজিদ মুবারক এবং বায়তুয যিকরে নফল নামায পড়তে যেতেন এবং বেহিশতি মাকবারায় দোয়া করতে যেতেন।

কাবাবীর জামাতের আমীর শরীফ অউদাহ সাহেব লেখেন,মরহুমাকে প্রথম সদর লাজনা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। নিরবিচ্ছিন্ন ছয় বছর পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করে এসেছেন।

কাউসার আরও বেশি লিখেছেন। শরীফ অউধা সাহেব ছয় বছর লিখেছেন। যাইহোক যতদিন তিনি সেখানে ছিলেন দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুমা বিভিন্ন ধর্মীয় দরস এবং তৎপরতার মাধ্যমে লাজনাদের তালিম ও তরবিয়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মরহুমা তাঁর উন্নত আচরণ ও নম্রতার মাধ্যমে জামাত আহমদীয়া কাবাবির এর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। খুব তাড়াতাড়ি আরবী বলা শিখে গিয়েছিলেন। জামাতের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যেন তিনি তাদেরই একজন। কাদিয়ান ফিরে আসার পরও বিগত কুড়ি বছর পর্যন্ত কাবাবিরের মেয়েদের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রেখেছিলেন। আর যখন সেখানে ছিলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের দেখাশোনা করতেন। আতিথেয়তা তার এক অনন্য গুণ ছিল। অনুরূপভাবে জামাতের সেন্টারের পরিচ্ছন্নতার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর এক ছেলে আতাউল মাজিদ মুবাশ্বের কাউসার জামাতের মুরুব্বি। তিনি যুক্তরাজ্যে এম.টি.এ আল আরাবিয়া-য় সেবারত। তাঁর কন্যা বুশরা কাউসার সাহেবা হল্যান্ডে ডক্টর আইমান অউদাহ সাহেবের স্ত্রী। তিনি লাজনা ইমাউল্লাহ হল্যাণ্ডের ন্যাশনাল সেক্রেটারী হিসেবে সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন। তাঁর ছোট ছেলে শরীফ কাউসার সাহেব কাদিয়ানে নায়েব সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া হিসেবে সেবা করছেন। তিনিও মুবাল্লিগ। এছাড়া তিনি অডিও-ভিডিও বিভাগে সহকারি ইনচার্জ হিসেবে নিয়োজিত আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন,তাঁর প্রতি কৃপা করুন এবং তাঁর সন্তানদের মধ্যেও তাঁর পুণ্যের ধারা অব্যাহত রাখুন। আমীন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হল লাহোরের মোকাররম নূরুল হক মাযহার সাহেব। মরহুম তানজানিয়ার মুবাল্লীগ রাগিব জিয়াউল-হক এর পিতা ছিলেন। তিনি সম্প্রতি মারা যান। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনিএকজন মুসী ছিলেন।

রাগিব সাহেব লেখেন,তাঁর পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তাঁর দাদু মুনশী মহম্মদ দীন সাহেবের মাধ্যমে, যিনি ১৯০৫ সালে তাঁর চাচা সঙ্গে বয়আতের আগ্রহ নিয়ে কাদিয়ানে এসেছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পিছনে নামায পড়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি বয়আতের আবেদন করেন, কিন্তু ঘোষনণা করা হয় যে, হযরত আকদস (আ.) অসুস্থতা বোধ করছেন, তাই এখন বয়আত নেওয়া হবে না। সেদিন বয়আত হল না, ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ার (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন। ১৯৭৪সালে তিনি ভাড়া ঘরে থাকতেন। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটায়। ঘরের সমস্ত আসবাব পত্র পুড়ে যায়। কেউ আশ্রয় দিচ্ছিল না। অবশেষে একজন আহমদী তাঁকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন। তিনি অনেক ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে সেই ছোট ঘরে কাটিয়েছেন। কখনও তাঁর মুখে কোন অনুযোগের সুর শোনা যায় নি আর সব কিছু পুড়ে গেছে বলে কোন আক্ষেপ করেন নি। আল্লাহ তা'লা কিছু দিন পরই তাকঁে নিজের বাড়ি তৈরীর তৌফিক দান করেন। তিনি একথাই বলতেন যে, এটা ১৯৭৪ সালের ত্যাগের প্রতিদান যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে তিনি যখন মোগলপুরায় মসজিদ পাহারা দিচ্ছিলেন, তখন অ-আহমদীরা মসজিদে আক্রমণ করে। তারা একটা লোহার রড দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে তাঁকে আহত করে দেয়। আজীবন তার মাথায় সেই দাগ থেকে যায়। রাগিব সাহেব বলেন, আমি আমার পিতাকে সব সময় দেখেছি তাহাজ্জুদে কান্নাকাটি করতে। তিনি নামাযের বিষয়ে বিশেষ নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। বাড়িতে নামায সেন্টার ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করতেন। পরিবারের সদস্যদেরকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত এবং নামাযের বিষয়ে উপদেশ দিতেন। একবার পাড়ার মসজিদের এক মৌলবী বক্তব্য দিতে গিয়ে বলে, আহমদীদের কুরআন পৃথক। তারা ভিন্ন প্দ্ধতিতে নামায পড়ে। আমাদের এক অ-আহমদী প্রতিবেশী সেই সময় মসজিদের মধ্যেই ছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মৌলবী সাহেব! আপনি ভুল বলছেন। কেননা পুরো গলিতে কেবল একটাই ঘর আছে যেখান থেকে কুরআন পাঠের শব্দ আসে আর সেটা হল নুরুল হকের বাড়ি। আর তিনি সেই কুরআনই পড়ে থাকেন যেটা আমরা পড়ে থাকি। বর্তমানে তো মৌলবীদের এতটাই ত্রাস এতটাই যে, এমন কথা কেউ বলতে পারে না। যাইহোক তিনি নিজের মহল্লায় অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির বুজুর্গ হিসেব পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুশয্যাতে অ-আহমদীরা, এমনকি যারা ঘোর বিরুদ্ধবাদী,তারা তাঁকে দেখতে তাঁর বাড়ি আসতেন। অত্যন্ত দানশীল এবং দরিদ্রদের সেবক ছিলেন। গোপনে অভাবীদের খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়ে দিতেন। তিনি রেখে গেছেন এক পুত্র ও তিন কন্যা। তাঁর এক কন্যা আমাতুল মতীন মুরুব্বী সিলসিলা আলীম মাহমুদ সাহেবের স্ত্রী। তিনিও ঘানায় থাকার কারণে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। মৃত্যুর সময় সেখানে তিনি ছিলেন না। তাঁর পুত্র রাগিব জিয়াউল হক তানজানিয়ায় মুরুব্বী হিসেবে সেবাদানের তৌফিক পাচ্ছেন। তিনি কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে পিতার জানায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমাসুন্দর আচরণ করুন এবং কৃপা করুন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য ও অবিচলতা দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল আমাতুল হাফিয নিগহাত সাহেবার যিনি মহম্মদ শফী সাহেব মরহুম (রাবোয়া)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন। মরহুমা মূসী ছিলেন। তিনি জার্মানীর মুবাল্লিগ সিলসিলা মুবারিক তানবীর সাহেবের শ্বাশুড়ি ছিলেন। তাঁর মেয়ে আমাতুল জামীল গাজালা জর্মানীতে নায়েব সদর লাজনা হিসেবে জামাতের সেবা করছেন। আমাতুল জামীল সাহেবা লেখেন, আমার মা নামায ও রোযার বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি উচ্চ গুণাবলীর আধার ও পুণ্যবতী ছিলেন। কেউ দোয়ার জন্য বললে তিনি নিজের জন্য সেটা অনিবার্য করে নিতেন এবং পূর্ণ মনোযোগ ও নিষ্ঠাসহকারে এবং ব্যথিত হৃদয়ে তার জন্য দোয়ায় নিমগ্ন হতেন। খিলাফতের প্রতি অপার ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। ছোটদেরকেও এই শিক্ষা দিতেন। জামাতের কাজে উদ্যমের সাথে অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি আমাদেরকে হাতে কলমে শিখিয়েছেন যে, ধর্মের সেবা-ই হল আমাদের মূল সম্পদ। লাজনাদের বিভিন্ন পদে খিদমতের তৌফিক পেয়েছেন। তবলীগের প্রতি এক প্রকার উন্মাদনা ছিল। পায়ে হেঁটে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তবলীগের জন্য বেরিয়ে যেতেন। যতদিন সেখানে তবলীগের অনুমতি ছিল, যখন সেখানে ততটা বিরোধিতা হত না, মুকদ্দমা খুব বেশি হত না, সেই সময় তিনি তবলীগ করতেন। চিকিৎসা শিবির চালাতেন এবং হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিতরণ করতেন। তাঁর প্রচেষ্টার পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পঞ্চাশটির বেশি ফল-ও দান করেছেন। অর্থাৎ অনেক মানুষকে বয়আত করানোর তৌফিক পেয়েছেন। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু জ্ঞানার্জনের প্রতি ভীষণ আগ্রহ ছিল। ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়েই অনেক যুক্তিযুক্ত কথা বলতেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির বৌদ্ধিক স্তর অনুসারে তার সঙ্গে কথা বলতেন। তাঁর বাড়ি থেকে কখনও কোন যাচনাকারী খালি হাতে ফেরে নি। মেয়েদেরকে সব সময় তিনি বলতেন, যে লোকের কাছে হাত না পেতে উপার্জন করার চেষ্টা কর। অনেক দরিদ্র মেয়েদের তিনি নিজের বাড়িতে রেখে তাদের পড়াশোনা করিয়েছেন এবং খুশি মনে তাদের বিয়ের খরচবহন করেছেন। সব সময় তাদের প্রতি নম্র আচরণ করেছেন।গাজালা সাহেবা লেখেন,আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, তুমি ওয়াকফে জিন্দগী, তাই আমি তোমাকে আটকাব না। তুমি তোমার ছুটি কাটিয়ে ফিরে যাও। তিনি যখন গুরুতর অসুস্থ হলেন,তখন ভাইও বললেন, তাকে ডেকে নাও। কিন্তু তিনি বললেন, না,সে ওয়াক (উৎসর্গীত) আছে। ওকে ছাড়। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে। তাঁর অনেক নাতি-নাতিনী এবং দৌহিত্রী আছে, যারা প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে জামাতের সেবা করার তৌফিক পাচ্ছে। তিনি নিজের বাড়িতে এক পুণ্যময় পরিবেশ তৈরী করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর দুই জামাতাও জামাতের সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তাঁর পুণ্যের ধারাকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করুন।

(সৌজন্যে: আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ই আগস্ট, ২০২৪)

নিকাহ্‌র জন্য ওলীর অনুমতি অনিবার্য

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) খুতবা জুমআ প্রদত্ত ৮ই এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বলেন-

" বিবাহ সম্পর্কে এই বিষয়টি মেয়েদের জন্যও স্পষ্ট হওয়া জরুরী যে, যদিও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মেয়ের পছন্দকেও স্থান দেওয়া উচিত এবং মহানবী (সা.) মেয়ের পছন্দকে মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু ইসলাম এ বিষয়টিকেও মেনে চলতে বাধ্য করে যে, ওলীর অনুমতি ব্যতীত নিকাহ্ বৈধ নয়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন- " আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর পক্ষ থেকেই। আমাদের শরীয়ত বলে (অর্থাৎ ইসলামের শরীয়ত একথাই বলে) যে, কিছু ক্ষেত্রে শরিয়ত নির্ধারিত ব্যতিক্রম ছাড়া ওলীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নিকাহ বৈধ নয়। যদি এমন কোন নিকাহ হয়ে থাকে তা অবৈধ ও অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে। এমন মানুষদেরকে বোঝানো আমদের কর্তব্য। যদি তারা না বোঝে তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুন।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগেও অনেক সময় এধরণের ঘটনা ঘটেছে। এক যুবতী এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ করার বাসনা করে, কিন্তু তার পিতা অস্বীকৃতি জানায়। তারা দুজনে (কাদিয়ান নিকটস্থ স্থান) নঙ্গল এসে কোন মোল্লার কাছে নিকাহ পড়িয়ে নেয় এবং তাদের বিয়ে হয়ে গেছে বলে প্রচার করে বেড়ায়। এরপর তারা কাদিয়ান আসে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ সংবাদ প্রাপ্ত হলে তাদের উভয়কে কাদিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন এবং বলেন কেবল মেয়ের সম্মতি নিয়ে ওলীর অনুমতি ছাড়া নিকাহ পড়ানো শরীয়ত বহির্ভূত কর্ম। সেখানেও মেয়ে সম্মত ছিল এবং বলছিল যে, এই যুবকের সঙ্গে বিয়ে করব, কিন্তু তারা যেহেতু ওলীর অনুমতি ছাড়া নিকাহ পড়িয়েছিল এই কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাদেরকে কাদিয়ান থেকে বের করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে (কাদিয়ানে সেই যুগে হযরত মুসলেহ মওউদ-এর যুগেও এমন একটি নিকাহ পড়ানো হয়েছিল। তিনি বলেন) এই নিকাহটিও অবৈধ। তার মা-কেও আমি একথাই বলেছি। (ছেলের মাকে বলেছিল। একজন মহিলা এসে বলছিল যে, যেহেতু মেয়ে রাজি ছিল তাই আমার ছেলে নিকাহ করেছে। এতে কিসের এত বিপত্তি?) তিনি (রা.) বলেন, আমি তাকে বলেছি যে, তুমি তোমার ছেলের জন্য পাত্রী পেয়েছ তাই বলছ যে, মেয়ে যেহেতু রাজি আছে তবে ওলীর সম্মতির প্রয়োজন কি? কিন্তু তোমারও তো মেয়ে আছে। যদি তাদের বিয়ে হয়ে থাকে তবে তাদেরও হয়তো মেয়ে আছে। তাদের মধ্য থেকে কোন মেয়ে এরকমভাবে কোন পর পুরুষের সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে যাক- এটি কি তুমি পছন্দ করবে?"

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৫-১৭৬ থেকে সংকলিত)

অতএব যেরূপ পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে, পিতা-মাতাকেও কোন বৈধ কারণ ছাড়া মিথ্যা আত্মাভিমানের নামে সম্পর্ক না করার হঠকারিতা দেখানো উচিত নয় যার ফলে হত্যার মত নৃশংস অপরাধ না করে বসে। মেয়েদেরকেও ইসলাম ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আদালতে বা কোন মৌলবীর কাছে বিয়ে করার বা নিকাহ পড়ানোর অনুমতি দেয় না। যদি কোন বাধ্যবাধকতার পরিস্থিতি দেখা যায় তবে মেয়ে খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে পত্র লিখতে পারে, যিনি পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। অতএব ছেলে ও মেয়ে উভয়ই যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার নীতিকে সামনে রাখে তবে খোদা তা'লাও কৃপা করবেন।"

****

যদিও আমরা অনেকে পৃথিবীর জটিল পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত আছি, কিন্তু অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন না যে, কয়েকটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে কিরূপ তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে। আর এই তিক্ততা কিরূপ ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীতে পারমাণবিক বোমার এমন বিশাল ভাণ্ডার মজুত রয়েছে যা কয়েক ঘন্টার মধ্যে মানবসভ্যতাতে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্য যথেষ্ট, তথাপি আশ্চর্য হতে হয় যে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কার দিকে আমাদের মনোযোগ খুব কম।

পরমাণু অস্ত্র-প্রসার রোধ সাধারণ মানুষের চাপেই হওয়া সম্ভব।

অর্থাৎ যখন মানবতার কণ্ঠের সামনে অস্ত্র-ব্যাবসায়ী এবং যুদ্ধের ইন্ধনদাতা বিশ্বের শাসকশ্রেণীর কণ্ঠস্বর অবদমিত হয়।

বিভিন্ন জাতি ও তাদের নেতার উচিত হবে নিজেদের মনোযোগ জাতীয়-স্বার্থে কেন্দ্রীভূত রাখার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক স্বার্থকে সামনে রাখা।

প্রত্যেক পক্ষকে সহনশীলতার স্পৃহা নিয়ে পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রসারে এক ও অভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত।

এমন যুদ্ধের বিজয়ী কেউ হতে পারে না যেখানে প্রত্যেকে নিজেদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। বিশেষ করে যদি তা শেষমেশ পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগে প্ররোচিত করে আর এই সম্ভাবনাকেও প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

আমরা যদি বর্তমান যুগের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির অগভীর ভাবে বিশ্লেষণ করি, তবে স্পষ্ট হবে যে পৃথিবীর ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

পৃথিবী এমন এক আবর্তে আটকে পড়েছে যেখানে একটি বিবাদ অপর একটি বিবাদের জন্ম দিচ্ছে।

কেননা পারস্পরিক শত্রুতা এবং বিদ্বেষ পূর্বের চেয়ে বেশি পুঞ্জীভূত হচ্ছে।

শরণার্থী সংকটের দীর্ঘস্থায়ী সমাধান এটিই যে, যুদ্ধ প্রভাবিত দেশগুলিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত দ্বারা আয়োজিত ১৬তম শান্তি সম্মেলনে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত ১৬ ই মার্চ , ২০১৯, তারিখের সভাপতির ভাষণ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু

প্রতি বৎসর আহমদীয়া মুসলিম জামাত এই পিস সিম্পোযিয়াম অনুষ্ঠান করে। যাতে সমসাময়িক সমস্যা ও সাধারণ পরিস্থিতির সমীক্ষা করা হয়। আমি ঐ সমস্ত সমস্যাবলীর ইসলামী শিক্ষার আলোকে সমাধান উপস্থাপন করার চেষ্টা করে থাকি। যতদূর সম্ভব এই প্রসঙ্গের সাথে সম্পর্ক যুক্ত, বিশ্ব-স্তরে এই অনুষ্ঠানের কিরূপ প্রভাব বিন্যস্ত হয়। আমি পূর্বেও বলেছি, এটা আমি জ্ঞাত নই। তথাপি এর থেকে বাকী পৃথিবীর উপর কী প্রভাব বিস্তার হয়, তা উপেক্ষা করেও আমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং শান্তির প্রসারে স্বীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। আমি বিশ্বাস রাখি, আপনারা প্রত্যেকে আমার মত বিশ্বে প্রকৃত ও চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিলাষী।

নিশ্চিতরূপে আপনারা সবাই চান, বর্তমান যুগে বিশ্বে শান্তি ও সুখকে বিনষ্টকারী যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিবাদসমূহের অবসান হোক। এমন এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠা হোক, যেখানে জাতিসমূহ একে অপরের অধিকারের প্রতি যত্নবান থেকে পরস্পর মিলে মিশে শান্তির সাথে বসবাস করতে পারে। কিন্তু এটা এক চরম দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবসত্য যে, যেখানে যুদ্ধ ও বিবাদ থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল, সেখানে প্রতি বৎসর এর বিপরীত চিত্রই দেখা যাচ্ছে। শত্রুতা চরম আকার ধারণ করেছে আর যুদ্ধ নিত্য-নতুন রণাঙ্গনে উন্মুক্ত হচ্ছে। অপরদিকে প্রথম থেকে বিরাজমান পারস্পরিক বিরোধ মিটতে দেখা যায় না।

যদিও আমরা বিশ্বের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই বিষয়ে অবগতই নয় যে, কত দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে। আর এই তিক্ততার কত ধ্বংসাত্মক ফল সংকলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ Bloomber businessweek পত্রিকার বিগত সংখ্যায় পিটার কয় নামে একজন সাংবাদিক লিখেছেন, "যদিও পৃথিবীতে এই সময় এত পরিমাণ আণবিক অস্ত্র মজুদ আছে যা কয়েক ঘন্টায় মানব সভ্যতাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দিতে যথেষ্ট। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কার দিকে পৃথিবীবাসীর মনোযোগ খুব কম। এখন যেহেতু আমেরিকা ও রাশিয়ার অস্ত্র প্রসার রোধক চুক্তি সমাপ্ত হয়েছে, অতএব এই দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। এরূপ প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আণবিক অস্ত্রের এক নতুন প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হচ্ছে॥ যতদূর সম্ভব এই বিষয়ের সাথে সম্পর্ক, একজন সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে কি করতে পারে? তবে অস্ত্র প্রসার নীতির অবসান সম্ভব সাধারণ মানুষের নেতিবাচক চাপে। অর্থাৎ যখন যখন মানবতার কণ্ঠস্বরের সম্মুখে অস্ত্রের ব্যবসায়ীরা ও সর্বদা যুদ্ধের ইন্ধনদাতা বিশ্বের শাসকশ্রেণীর কণ্ঠস্বর অবদমিত হয়।

প্রবন্ধ লেখক নিজ প্রবন্ধ Middlebury Institute of International studies এর সাথে সংযুক্ত Nikolai Sokov এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি সতর্কীকরণও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। "সমস্ত লক্ষণাবলী এই বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করছে যে ইউরোপীয় দেশগুলি বিপজ্জনক সীমা পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র ও পারস্পরিক অস্ত্র-শস্ত্রের প্রতিযোগিতায় একে অপররের থেকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে।"

এই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশে এই বিষয়রে প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বস্তরে অস্ত্রের এক নতুন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। অধিকন্তু আণবিক যুদ্ধের বিপদের ধরণকে সাধারণ জ্ঞান করা উচিত নয়।

সাম্প্রতিককালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট আকস্মিক উত্তেজনার পরিস্থিতি বিশ্বের সামনে রয়েছে। এই দুটি দেশই আণবিক শক্তি সম্পন্ন। এরা উভয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে প্রকাশ্য ও গোপন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে রেখেছে। যে সব কারণে তাদের মধ্যে সংঘটিত যে কোন যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণতি অত্যন্ত ব্যাপক ও ধ্বংসাত্মক হবে।

আমি বারবার এই বিষয় প্রকাশ করেছি। কিছু আণবিক শক্তির নেতারা সর্বদা পরমাণু বোমা ব্যবহার করার জন্য দেখা যাচ্ছে প্রস্তুত হয়ে আছে। যদ্বারা অনুভূত হচ্ছে, হয়ত তারা এই ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। এই অস্ত্র না শুধু ঐ সমস্ত দেশকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম, যাদের বিরুদ্ধে এগুলি ব্যবহৃতহয়। বরং ঐগুলির ব্যবহার সারা দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য

উদ্বেগজনক। এই জন্য এটাই আবশ্যক জাতি-সমূহ এবং তাদের নেতারা শুধু নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পরিবর্তে বিশ্ব-স্বার্থে সম্মুখ দৃষ্টি রাখুন। শান্তির প্রসারে অন্যান্য দেশ ও সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। প্রতিটি পক্ষকে সহনশীলতার স্পৃহা নিয়ে বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রসারের ন্যায় এক অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করা উচিত।

SpiegelOnline কে দেওয়া সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে জার্মানীর প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী Sigmar Gabriel সতর্ক করে বলেছেন, বিশ্ব-বর্তমান ভূ-রাজনীতির পরিণামে উদ্ভুত বিপদকে অবজ্ঞা করছে। তিনি বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিকে ইং ১৯৪৫ সাল এবং ইং ১৯৮৯ সাল এর পরিস্থিতির সাথে তুলনা করে বলেন, "বিশ্ব পরিস্থিতি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।..... পাশ্চাত্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে।.... বিগত সত্তর বৎসর কালে সংঘটিত একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন এই যে, প্রথমে আমেরিকাকে একটি বিশ্বস্ত দেশ হিসেবে মনে করা হত। কিন্তু আজ আমরা এমন একটা যুগের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছি যখন ইউরোপ স্বায়ত-শাসন যুদ্ধের সম্মুখীন। "

এইরূপে নিউইয়র্ক টাইমসের একটি প্রবন্ধে রাশিয়ার প্রাক্তন নেতা Michail Gorbachev বিবৃতি দেন, আমেরিকা রুশের মধ্যে সাম্প্রতিক আই.এন.এফ চুক্তি সমাপ্ত হওয়ার ফলে আণবিক অস্ত্রে এক নতুন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। তিনি লেখেন, " অস্ত্রের এক নতুন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। সামারিকীকরণের পরিণামে উদ্ভুত আই.এন.এফ চুক্তির পরিসমাপ্তি বিশ্বে এই প্রথম কোনও ঘটনা নয়। ইতিপূর্ব্বেই ২০০২ সালে আমেরিকা অ্যান্টি ব্যালাস্টিক মিসাইল চুক্তি থেকে সরে এসেছিল। এই বছরে ইরানের সাথে আণবিক চুক্তির অবসান হওয়াও এই প্রবণতার পরিণাম। সামরিক ব্যয় আকাশ ছোঁয়া এবং দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে সতর্ক করে গবার্চ লেখেন, এরূপ যুদ্ধে কেউ জয়লাভ করতে পারে না। যারা সবাই মিলিত হয়ে নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করছে। বিশেষতঃ যদি তারা আণবিক অস্ত্র ব্যবহারে অগ্রগামী হয়। এই সম্ভাবনাকে খণ্ডন করা যেতে পারে না। বেপরোয়া অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক স্তরে উত্তেজনা, শত্রুতা এবং অবিশ্বাসের পরিবেশ আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার কাজ করছে।"

সুতরাং বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবিদরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, আণবিক যুদ্ধ এখন আর ধারণাতীত নয়, বরং আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও একে অবজ্ঞা করা যেতে পারে না।

যদি আমরা বর্তমান কালের বাছাই করা সমস্যাবলীর মোটামুটি পর্যবেক্ষন করি, তাহলে এই বিষয় প্রতীয়মান হয়ে যাবে পৃথিবীর ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গত বছর আমেরিকা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে দাবি করেছিল, তাদের উত্তর কোরিয়ার সাথে একটি ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি হবে। এখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই বিষয়ে কোন বিশেষ কৃতকার্যতা লাভ হয় নি।

এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে চলমান বিবাদ তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রায় এক দশক থেকে সিরিয়ায় রক্তপাত অব্যাহত রয়েছে। দেশে চরম অরাজকতা বিরাজ করছে। এটা বলা হচ্ছে গৃহযুদ্ধ প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু গত দশ বছরে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু আর এর চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের গৃহহারা হওয়া ছাড়া কী লাভ হয়েছে? এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের কোনও সদর্থক পরিণাম প্রকাশ পায় নি। এখন ভবিষ্যত অনিশ্চিত ও আশঙ্কাপূর্ণ। কেননা এই সমস্ত দেশ যাদের ব্যক্তিস্বার্থ সিরিয়ার ভবিষ্যতের সাথে জড়িত, তাদের মধে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে রাশিয়া ও তুরস্কের জোট, তো অন্যদিকে আমেরিকা ও সৌদি আরব মিলিত হয়ে ইরানের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। এবং তারা আরও বেশি নিষেধাজ্ঞা চাপানোর চেষ্টায় আছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ খোলাখুলিভাবে একথা প্রকাশ করছেন যে, ঐসমস্ত দেশের উদ্দেশ্য কেবল মধ্যপ্রাচ্যের উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।

তুরস্ক ও কুর্দ জাতির মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা আরও একটি উদ্বেগজনক ব্যাপার, যেখানে কুর্দরা স্বায়ত্বশাসন লাভ করতে চাইছে।

সুতরাং বিশ্ব এক জটিল আবর্তে আটকে পড়েছে, যেখানে একটি বিবাদ নতুন অন্য একটি বিবাদ সৃষ্টি করছে। কেননা পারস্পরিক শত্রুতা ও ঘৃণা পূর্বের থেকে গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। কেউ জানেনা এই সমস্যা আমাদেরকে শেষে কোথায় নিয়ে যাবে এবং এর কত ভয়াবহ ফল প্রকাশিত হবে। এই সব কিছু আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেছি। এইসব ব্যতীত অনেক এমন উদ্বেগজনক সমস্যা রয়েছে, যদ্বারা বিশ্বের শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এটা বলা হচ্ছে , সন্ত্রাসবাদী সংগঠন দায়েশ বা ইসলামিক স্টেট এখন নিজেদের বিনাশের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের তথাকথিত খেলাফতের পতন ঘটেছে। কিছু বিশেষজ্ঞ এখনও সর্তক করছেন। যদিও 'দায়েশ' নিজ এলাকায় আধিপত্য হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তার চরমপন্থী মতবাদের প্রাণের স্পন্দন এখনও অবশিষ্ট আছে। তাদের যে সমস্ত সদস্যরা বেঁচে গেছে, তারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। তারা যে কোনও সময় দ্বিতীয়বার সুসংঘবদ্ধ হয়ে ইউরোপে কিম্বা অন্য কোনও স্থানে আক্রমণ করতে পারে। অধিকন্তু পশ্চিমী দুনিয়ার মস্তিষ্কে জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়েছে। আর দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত উগ্রপন্থীরা জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

এই সমস্ত দলগুলি অবশ্য রাজনৈতিকভাবে স্পষ্ট সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠা না হয়, এই সব পার্টিগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকবে। তাদের জনপ্রিয়তার একটা বড় ও মৌলিক কারণ শরণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি। যদ্বারা জনসাধারণের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হচ্ছে যে, এই সমস্ত দেশের জন্মগত নাগরিকদের সম্পদ তাদের উপর খরচ হওয়ার পরিবর্তে বিদেশী শরণার্থীদের সাহায্যার্থে খরচ করা হচ্ছে। আমি পূর্বেও এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তাই পুরাতন কথা পুনরুক্তি করতে চাই না। এটা বলা যথেষ্ট, যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত প্রচেষ্টা করা হয় এবং সব দেশকে উন্নতির জন্য সাহায্য দেওয়া হয়, তাহলে লোকেরা নিজ ঘর থেকে পালিয়ে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা ও ইচ্ছা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্ষীণ হয়ে যাবে।

জনসাধারণ শুধু এটাই চায়, তারা যেন নিজ পরিবার-পরিজনের ভরণপোষন করতে সক্ষম হয়। তাদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলে উন্নত জীবন লাভের জন্য এই সব লোকেরা নিজ দেশত্যাগ করার চেষ্টা করবে। সুতরাং শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধান এটাই যে, যুদ্ধ প্রভাবিত দেশে শান্তি স্থাপন করা। সেখানে নিরুপায় অবস্থায় ভয় ও দারিদ্রতার সাথে জীবনযাপন করতে বাধ্য জনসাধারণের সাহায্য করা, যাতে তারা নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং শান্তির সাথে জীবনযাপন করতে পারে।

সংক্ষিপ্তভাবে এটাই যে, শরণার্থী বা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরা যখন নিজ দেশের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পরিস্থিতির কারণে পাশ্চাত্য দেশে প্রস্থান করে, তখন তাদের সাথে যেমন শ্রদ্ধা ও সম্মানজনক আচরণ হওয়া উচিত। তেমনি এটাও লক্ষ্য করা উচিত যে, তাদের সাহায্য ও সুবিধা প্রদান করতে গিয়ে স্থানীয় নাগরিকদের সুযোগ সুবিধায় যেন প্রভাব না পড়ে।

শরণার্থীরা দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি অনুদান স্বরূপ ভাতা ও অনুগ্রহ নিয়ে জীবনযাপন করতে থাকুক, তার চেয়ে বরং তারা নিজেরাই যেন যথাশীঘ্র জীবনোপকরণের উপযোগী কোনও উপায় উদ্ভাবন করে সে জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা উচিত। তাদের নিজেদেরও উচিত পরিশ্রম করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা, সমাজের উন্নতিতে সদর্থক ভূমিকা পালন করা। নতুবা যদি তারা অবিরত করদাতাদের অর্থ থেকে সাহায্য পেতে থাকে, তাহলে অবশ্যই অভিযোগ সৃষ্টি হবে।

আমি এটা বুঝতে পারছি, সমাজে বিদ্বেষ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে জীবিকা ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রধান ভূমিকা রয়েছে। কিছু কিছু সংগঠন এই অস্থিরতাকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়ে শরণার্থীদের কিংবা কোনও বিশেষ ধর্মবালম্বীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলে এবং তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রসার করে।

সুতরাং ইউরোপের মানুষের মধ্যে এই প্রতীতি জন্মেছে যে, এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষেরা বিশেষতঃ দেশত্যাগী মুসলমানরা তাদের সমাজের জন্য বিপজ্জনক। আমেরিকাতেও লোক মুসলমান ও স্পেনীয় মানুষজনের সম্বন্ধে যারা মেক্সিকানদের দ্বারা সে দেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে, তাদের সম্পর্কেও এই রকমের আশঙ্কা পোষণ করে। যাহোক আমার এই বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস, যদি বৃহৎ শক্তিগুলি ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষা করে আন্তরিক হয়ে দরিদ্র দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে সচেষ্ট হয়, তাদের সঙ্গে সহানুভূতি, সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে, তবে এইরকমের সমস্যা সৃষ্টিই হবে না।

এখানে ব্রিটেনে ব্রেক্সিট ও ভবিষ্যতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ব্রিটেনের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিস্থিতি অত্যন্ত অনিশ্চিত। ইং ২০১২ সালে ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টে আমার বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গে আমি স্পষ্টভাবে একথা ব্যক্ত করে বলেছিলাম, " আপনাদের একে অপরের অধিকারকে সম্মান করে এই ঐক্য বজায় রাখার সবরকম প্রচেষ্টা করা উচিত। জনসাধারণের ভীতি ও উৎকণ্ঠা যে কোনও প্রকারে দূরীভূত হওয়া চাই।"

আমি ঐ সময় বলেছিলাম যে, ইউরোপের শক্তিশালী হওয়া

ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে নিহিত। এই প্রকারের একতা না শুধু এখানে ইউরোপের লাভ হবে, বরং বিশ্বস্তরে এই একতা এই মহাদেশের প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপন করার মাধ্যম হবে।

সাত বৎসর পূর্বে আমি নিজ বক্তৃতায় অভিবাসন সম্পর্কে জন-সাধারণের ভয়-ভীতি দূর করার গুরুত্ব ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঐক্যস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলাম।

তথাপি মানুষের মনে বদ্ধমূল আশঙ্কার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ দেওয়া হয়নি। একারণে সমগ্র ইউরোপের লোকেরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপযোগিতার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। ব্রেক্সিট এর নিকৃষ্টতম উদাহরণ । কিছু ইউরোপীয় দেশে যেমন ইতালি, স্পেন ও এমনকি জার্মানীতেও জাতীয়তাবাদী দলগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং রাজনৈতিক ময়দানের আসনেও জয়লাভ করছে। এ কারণে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আরও শক্তিহীন করার প্রয়াসের পাশাপাশি অভিবাসন বিরোধী এজেন্ডার প্রসার করছে।

আমার ধারণা ছিল, ইউরোপ নিজ ঐক্যের আরও প্রসার ঘটাবে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর থেকে এখানে বিভেদ ও এর ফলে উদ্ভুত বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এইরকম অস্থিরতা কেন সৃষ্টি হচ্ছে? এই অস্থিরতা কিছুটা অর্থনৈতিক কারণ থেকে আর কিছুটা কোনও কোনও রাষ্ট্রের জনসাধারণের সাথে ন্যায় ও বিচারের ব্যাপারে ব্যর্থতা, এবং স্বীয় নাগরিকদের অধিকারসমূহ রক্ষা করতে অপারগতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আমার দৃষ্টিকোণ এটাই যে, বিশ্বস্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা বিশ্বের পরিস্থিতি উন্নতি সৃষ্টি করতে ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়টিকে সামনে দৃষ্টিতে রেখে আমি ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বলেছিলাম,"ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুসারে আমাদের সারা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করা উচিত। কারেন্সির দিক থেকেও সারা বিশ্বকে একত্রিভূত হওয়া উচিত। এইভাবে ব্যবসা-বানিজ্যের দিক থেকেও এক হওয়া উচিত। এছাড়াও অবাধ যাতায়াত এবং অভিবাসনের জন্যও উপযোগী এবং বাস্তবায়নযোগ্য নীতি প্রণয়ন করা উচিত যাতে সারা বিশ্ব এক হয়ে যায়।"

সুতরাং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এটাই যে, ঐক্য স্থাপনই শান্তির সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে আমরা বিচ্ছিন্নতার শিকার, আর বিশ্বের সম্মিলিত স্বার্থের উপর ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, এই প্রকারের নীতি আগামীকালে বরং বর্তমানকালে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তাকে দুর্বল করার হেতু হচ্ছে। ইসলামী শিক্ষার আলোকে শান্তি-প্রতিষ্ঠার এক মৌলিক দাবি এটাই যে, জাতিসমূহ যেন একে অপরেরর সাথে ন্যায়ের আচরণ অব্যাহত রাখে।

যদি কিছু দেশ সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে অন্যান্য জাতির উচিত ঐ সমস্ত দেশকে নিঃস্বার্থ হয়ে সাহায্য করা আর ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ কোরআন করীমে আছে, যদি দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বা মত পার্থক্য হয়, তাহলে অপরাপর জাতির উচিত তারা যেন কোনও পক্ষের পক্ষপাতিত্ব না করে সালিস বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। আর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, যদি এক পক্ষ অন্যায়ের উপর অনড় থাকে, আর শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে প্রস্তুত না হয়, তা হলে অপরাপর জাতির উচিত অত্যাচারী জাতিকে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। যখন অত্যাচারী পক্ষ তদের বাড়াবাড়ি থেকে বিরত হয়, তখন এই অবস্থায় ইসলাম স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়েছে, অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বা সেই দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে কখনই যেন প্রতিশোধ না নেওয়া।

কিন্তু কিছু কিছু দেশের দৃষ্টন্ত আমাদের সামনে রয়েছে, যারা যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাতিদের এলাকায় হস্তক্ষেপ করে বা শান্তির নামে ঐ সমস্ত পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু নানা অজুহাতে তাদের দেশের সম্পদ কুক্ষিগত করে। শক্তিশালী জাতিসমূহ নিজেদের অর্থ ও সম্পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে নিজ শক্তি-বলে দুর্বল দেশগুলির উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে।

যেমন আমি বলেছি, পূর্ব হোক বা পশ্চিম, আর্থিক বা সামাজিক অসাম্যই এই অস্থিরতার মূল কারণ। এই উদ্দেশ্যে জাতি ও দেশসমূহের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য কম করার জন্য সদর্থক চেষ্টা করা আবশ্যক। এছাড়াও রয়েছে সকল প্রকার চরমপন্থা ও গোঁড়ামী।, সেটা ধর্মীয় বা জাতিগত ভিত্তির উপর বা কোনও রকমের হোক। আমাদের সবাই মিলে চেষ্টা করা উচিত এর অবসান করা।

যে সমস্ত দেশের সম্বন্ধে এই বিষয়টি স্পষ্ট সেখানকার লোক কষ্টের মধ্যে আছে। তাদের নেতারা তাদের অধিকার রক্ষা করছেন না। সেখানে শান্তি স্থাপনকারী বিশ্ব-সংগঠন গুলি বিশেষত জাতি সংঘের উচিত আইনের বেষ্টনীতে থেকে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের অধিকার রক্ষা ও সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বৈধ ও সমুচিত চাপ সৃষ্টি করা।

ইসলাম সম্পর্কিত যতদূর সম্ভব, কারো মনে এই ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, মুসলমান দেশগুলি তো নিজেরাই কয়েক বৎসর থেকে মতবিরোধ ও অস্থিরতার শিকার। তাহলে ইসলাম আবার শান্তি স্থাপনে উল্লেখযোগ্যরূপে কী শিক্ষা দিতে পারে? তবে এর উত্তর এই যে, ঐ সমস্ত মুসলমান দেশগুলির এই দুর্ভাগ্য জনক অবস্থা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণেই।

ইসলামী পদ্ধতিতে সরকার ও নেতৃত্বের প্রকৃত ছবি দেখতে ও বাস্তবতা জানার জন্য আমাদের ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদস মহম্মদ (সা.)-এর কল্যাণময় যুগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। মদিনা থেকে হিজরত করার পর তিনি (সা.) ইহুদীদের সাথে চুক্তি করলেন। সে অনুসারে মুসলমান ও ইহুদী নাগরিকরদের একে অপরের সাথে শান্তির সাথে ও পারস্পরিক সহানুভূতি, সহনশীলতা ও সাম্যের প্রেরণা সঞ্চারের মাধ্যমে মিলে মিশে বসবাস করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই চুক্তি মানুষের অধিকার রক্ষা ও ন্যায়ের পদ্ধতিতে রাষ্ট্র বিরাট বিক্ষিপ্ত মুক্তোর মত প্রমাণিত হয়েছিল, যা মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি সুনিশ্চিত করেছিল। এই চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একে অপরের অধিকারের প্রতি যত্নবান থাকা সমস্ত মানুষের কর্তব্য ছিল। মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য ছিল। ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতা এই চুক্তির মূল ভিত্তি ছিল।

ঐক্য এই চুক্তির ভিত্তি ছিল, কেননা তদনুযায়ী মদীনার উপর আক্রমণের পরিস্থিতিতে মুসলমান ও ইহুদীদের সম্মিলিত হয়ে প্রতিরোধ করা আবশ্যক ছিল। এছাড়া নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রথা অনুযায়ী সমাধান করার অধিকারও প্রত্যেক জাতির ছিল। ইতিহাস এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, নবী করীম (সা.) এই চুক্তির প্রতিটি শর্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেছিলেন।

শরণার্থী হিসেবে মুসলমানেরা এই নতুন সমাজের উন্নতিতে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছিল। আর মদীনার নাগরিকদের অধিকারের প্রতি যত্নবান ছিল। সুতরাং এই সমাজ বিভিন্ন জাতির ঐক্য ও কৃষ্টির ঐক্যতানের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মদীনা চুক্তি প্রকৃতপক্ষে কুরআনের শিক্ষার মূলনীতি অনুযায়ী ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআন করীমের সূরা আন নহলের ৯১ নং আয়াতে খোদা তা'লা বলেছেন, "আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশ দিতেছেন।"

কিন্তু কুরআন করীম মানুষ ও জাতির সাথে সামাজিক রীতিনীতি ও আচরণের তিনটি ধাপ উপস্থাপন করেছে।

প্রথম ও সবচেয়ে নীচের ধাপ ন্যায় বিচার। যার অধীনে প্রত্যেকের সাথে ন্যায়পরায়ণতা ও সহনশীলতার আচরণ করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি কুরআন করীম নির্দেশ করেছে। ন্যায়পরায়ণতার এই মানের উল্লেখ কুরআন করীমের সূরা নিসার ৩৬ নং আয়াতে আছে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই সাক্ষ্য তোমাদের নিজের বা পিতামাতার এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। (যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে) সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক, আল্লাহ্ই উভয়ের সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব তোমরা যাতে ন্যায়বিচার করতে (সক্ষম) হও (সেজন্য) তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বল অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে যাও তাহলে (মনে রেখ) তোমরা যা কর সে সম্পন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় পুরোপুরি অবহিত।"

অতএব কুরআন করীম অনুসারে ন্যায়পরায়ণতার দাবি এটা, এক ব্যক্তি সাক্ষী দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। যদিও সে তার বিরুদ্ধে হোক বা তার আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে, যাতে সত্যের জয় হয়।

সমাজিকতার দ্বিতীয় ধাপ যা কুরআন করীমে বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা এই, এক ব্যক্তি না শুধু ন্যায়পরয়ণ হবে, বরং এরও অধিক অপরের সাথে স্নেহশীল বা উদারতাপূর্ণ আচরণ করবে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমার বক্তৃতায়

বলেছি কুরআন করীম এই শিক্ষা দেয়, যখন তোমরা একটি অন্যায়কারী জাতিকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখতে কৃতার্থ হয়ে যাও, তখন প্রতিশোধ নিও না। না তাদের উপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করো।

বরং তোমাদের উচিত, তাদের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে এবং মৌলিক সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করতে তাদেরকে সাহায্য করা। যেথায় এই উপায়ে তাদের লাভ হবে, সেখানে ভবিষ্যতে তোমাদেরও লাভ হবে। যদি ঐ সমস্ত দেশ যারা যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে দৃঢ় ও স্থিতিশীল হয়ে যায়, তাহলে তারা হতাশা ও বঞ্চনার কারণে নিজেদের মধ্যে অন্যান্য দেশের প্রতি ঘৃণার ও বিদ্বেষ জন্ম নিতে দিবে না। না সেখানকার লোক হিজরত করতে বাধ্য হবে।

এটা সেই বিজ্ঞতা যা ইসলামী শিক্ষায় অন্তর্নিহিত। মৌলিক ন্যায় ও বিচার দেওয়ার পর আরও অনুগ্রহপূর্ণ ও কোমল আচরণ করা উচিত।

সমাজের তৃতীয় ধাপের মান যা কুরআন করীমে শেখানো হয়েছে, সেটা এই যে, অপরের সাথে এমন আচরণ করা যেমন মা নিজ সন্তানদের প্রতি সহজাতভাবে স্নেহ করে থাকেন। এই খাঁটি স্নেহ-ভালবাসা কোনও রকম পুরস্কারের প্রত্যাশায় করে না। অপরের সাথে একজন মায়ের স্নেহ-ভালবাসার মত খাঁটি হয়ে অনুগ্রহপূর্ণ উদ্দেশ্যে আচরণ করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু এই মানদণ্ডের প্রতি সর্বদা আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত।

মোটকথা শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে মুসলিম দেশগুলি হোক বা আন্তর্জাতিক স্তরে, এটা আবশ্যক যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ন্যূনতম ন্যায়-বিচারের দাবি পূর্ণ করা যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সমান অধিকার পায় ও ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে গিয়ে ন্যায় ও বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়। অধিকন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন জাতিসংঘ প্রত্যেক দেশের সাথে যেন সমান ব্যবহার বজায় রাখে। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মীমাংসা করতে কিছু প্রতিপত্তিশালীদের স্বার্থে যেন এক দিকে আকৃষ্ট না হয়ে যায়। এটা শান্তি অর্জনের জন্য আবশ্যক। আর এর উপর কার্য-সম্পাদন করে আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এটা মানব জাতিকে ভয়ানক ধ্বংস থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ।

এই কয়েকটি কথা বলে আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বে প্রকৃত শান্তি স্থাপন করুন। আল্লহ্ করুন যুদ্ধ-দাঙ্গার ভয়াবহ ছায়া যা ক্রমশ ঘনীভুত হচ্ছে, শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধির আলোকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমার দোয়া এই যে, নিরাশা ও বঞ্চনার অবসান হোক, যে কারণে অসংখ্য মানুষ অস্থিরতার সম্মুখীন। সে কারণে বিশ্ব ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পরিবেষ্টনে সমাচ্ছন্ন।

আমার দোয়া এই, অপরের উপর কর্তৃত্ব করার ও শুধু নিজের অধিকার রক্ষা করার পরিবর্তে দেশ ও তাদের প্রধান প্রধান নেতারা যেন সেই সব কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে, যা একে অপরের অধিকার প্রদানের দ্বারা অর্জিত হবে। আমি দোয়া করি, বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার দায় এক বিশেষ ধর্ম বা জাতিকে না চাপিয়ে আমরা যেন একে অপরের ধর্মবিশ্বাস ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করি। সমাজে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সমন্বয়কে সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। আমি দোয়া করি, আমরা যেন মানবতার সর্বোত্তম মূল্যবোধ রক্ষাকারী হই আর নিজ সন্তানদের জন্য এক উন্নত সমাজ গঠনে একে অপরের গুণাবলী ও নৈপুণ্যতাকে কাজে লাগিয়ে শান্তির নিবাস গড়ে তুলি। নতুবা এর বিপরীতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, যা কল্পনা করাও অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

ইতিপূর্বে আমি অনেক বিশেষজ্ঞদের মতামত বর্ণনা করেছি যা আণবিক যুদ্ধ ও বিশ্বে অস্ত্র প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সতর্ক করে নিজেদের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধাবলী ও ঐ রকম আরও অনেক প্রবন্ধাবলী এই বিশ্লেষনকে সমর্থন করে যে বিশ্ব অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এক ভয়াবহ বিনাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এমন বিনাশ যা মানুষ ইতিপূর্বে কখনও দেখে নি আর যা প্রতিহত করা সম্ভব হবে না।

এক নিরীক্ষণ অনুযায়ী আণবিক যুদ্ধ পৃথিবীর নব্বই শতাংশ ভূখণ্ডের উপর প্রভাব ফেলবে। আর যদি আণবিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহলে আমরা কেবল বর্তমান বিশ্বের ধ্বংসের জন্য দায়ী হব না, বরং নিজ পশ্চাতে রেখে যাব বিনাশলীলার এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব। সুতরাং আমাদের উচিত, একটু থেমে গিয়ে নিজ চিন্তাধারা, সিদ্ধান্ত ও কর্মসমূহের ভয়াবহ পরিণতির নিয়ে চিন্তা করা।

আমাদের কোন বিষয়কে যেটি কোনও দেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা আন্তর্জাতিক প্রকারের হোক, সাধারণ বোধ করা উচিত নয়। আমরা অর্থনৈতিক বিষষের সমাধান করছি বা শরণার্থী সমস্যার সমাধান খুঁজছি বা আর কোনও সংকট বিবেচনাধীন থাকুক, আমাদের ধৈর্য সহকারে প্রচেষ্টা চালিয়ে ঐ সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর করা উচিত যা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। আমাদের সর্বশক্তি ও বল শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যয় করা উচিত। আমাদের ঝগড়া-বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করা উচিত। পরস্পর বৈঠক করে আলোচনা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা উচিত। একে অপরের অধিকার প্রদান ও রক্ষার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদিগকে এরূপ করার তৌফিক দান করুন। আমীন। এই কথার সাথে আমি সব অতিথিবৃন্দকে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।

লজ্জাশীল পোশাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আবশ্যক। যদি আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাই তবে এর শিক্ষামালাকে মেনে চলতে হবে।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশের আলোকে পর্দার গুরুত্ব

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ১৩ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত খুতবায় বলেন:

"প্রথম কথা যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত তা হল এই যে, যদি আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাই তবে এর শিক্ষামালাকে মেনে চলতে হবে। যদি আমরা ঘোষণা দিয়ে থাকি যে, আমরা মুসলমান এবং এই ধর্মের উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত তবে এই আদেশমালা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসুল (সা.)-এর নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

সুতরাং লজ্জাশীল পোশাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আবশ্যক। প্রত্যেক আহমদী কন্যা-সন্তান যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করে, সে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রধান্য দেওয়ার অঙ্গিকার করেছে। একজন আহমদী সন্তান, একজন আহমদী যুবক এবং একজন আহমদী মহিলা যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছে তারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গিকার করেছে। এই প্রধান্য দেওয়া তখনই প্রমাণিত হবে যখন ধর্মের শিক্ষার উপর অনুশীলন হবে। এটিও আমাদের সৌভাগ্য যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের জন্য প্রত্যেকটি বিষয় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি (আ.) পর্দহীনতা এবং লজ্জাহীনতা সম্পর্কে একস্থানে বলেন-

" ইউরোপের ন্যায় পর্দহীনতার উপরও মানুষ জোর দিচ্ছে, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ গর্হিত কর্ম। মহিলাদের এই স্বাধীনতাই সমস্ত প্রকারের বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতাপূর্ণ আচরণের মূল। যে সমস্ত দেশ এই ধরণের স্বাধীনতাকে প্রচলন দিয়েছে তাদের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটু অনুমান করুন। যদি মহিলাদের স্বাধীনতা এবং পর্দাহীনতার ফলে তাদের সতীত্ব ও পবিত্রতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তবে আমরা স্বীকার করব যে, আমরা ভুল। কিন্তু নারী ও পুরুষ যখন যৌবনে পদার্পণ করে আর সেই সময় তারা লাগামহীন হয়ে পর্দাহীনতা অবলম্বন করে তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কোন বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছাবে তা স্পষ্টরূপে অনুমান করা যায়। "

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৪-১৩৫)

বর্তমান যুগে আমরা সমাজের মধ্যে যে সমস্ত কদাচার দেখতে পাই তা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যেকটি বাক্যকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করছে। অতএব প্রতেক আহমদী নারী ও পুরুষের উচিত নিজেদের সম্ভ্রমশীলতার উচ্চ মান বজায় রেখে সমাজের কলুষতা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা। 'পর্দা কেন আবশ্যক'- এমন প্রশ্নের অবতারণা করা বা পর্দার বিষয়ে হীনমন্যতার শিকার হওয়া উচিত নয়।"

আমরা দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পর্দার গুরুত্ব অনুধাবন করার তৌফিক দান করেন। আমীন

(নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 29 Aug, 2024 Issue No.35

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(২ পাতার পর.....)

সেই সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হতে থাকে আর বিরোধীতা বাড়তে থাকে। আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা বয়কট করে। লোকেরা আমাদেরকে কাদিয়ানী বলে কটাক্ষ করতে থাকে। ছেলেমেয়েদেরকে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করে। মুসলমান দোকানদারেরা আমাদের কাছে মালপত্র বিক্রি বন্ধ করে দেয়। হত্যা ও মারধর করার ধমকি দেওয়া হতে থাকে। আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচিত হতে থাকে। পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। বিরোধীতা ক্রমেই বাড়তে থাকে, কিন্তু এই সব কিছু আমাদের উপর কোন প্রভাব ফেলে নি। আমরা নিজেদের সংকল্প ও ঈমানে অবিচল ছিলাম। আমার ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে অনেক জ্বালাতন করা আরম্ভ হয়। সহপাঠিরা এই বলে উত্যক্ত করত যে তোমরা অর্থের লোভে বয়আত করেছ। সেই সব ছাত্রদেরকে স্কুলের শিক্ষক ও কিছু মৌলবী শিখিয়ে রেখেছিল যে এরা টাকার জন্য নিজেদের ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে। চতুর্দিক থেকে আমাদেরকে যাতনা দেওয়া হচ্ছিল। ছেলেমেয়েদের বাইরে বেরনো কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা সকলে উদ্বিগ্ন ছিলাম। স্কুল যাওয়া, টিউশনে যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীরা সামাজিক বয়কট করে। কেউ কথা বলত না। মোটকথা তাদেরকে যাতনা দেওয়ার কোন পন্থায় তারা বাদ রাখে নি। স্বামীর সঙ্গেও দোকানদারেরা দুর্ব্যবহার করা আরম্ভ করে। তাঁর দোকানের সামনে কয়েকজনকে পাহারায় নিযুক্ত করে দেওয়া হয় যাতে কোন আত্মীয়স্বজন আমাদের বাড়িতে আসতে না পারে। মুসলমানেরা আমাদের দোকান থেকে মালপত্র নেওয়া বন্ধ করে দেয় যার কারণে আমাদের দোকানের ব্যবসা ক্রমশ গুটিয়ে আসছিল। আমার স্বামী বাড়ি ফিরে সারা দিনের ঘটনা বৃতান্ত আমাদেরকে শোনাতেন। একরাতে প্রায় বারোটার সময় আমরা যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, পাড়ার একটি ছেলে চিৎকার বলে তোমাদের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির সমস্ত পুরুষ সদস্য দ্রুত পায়ে দোকানের দিকে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে আগুন জ্বলছে। যাইহোক ফায়ার ব্রিগেড এসে তা নেভানোর কাজে লেগে যায়। আল্লাহ্‌র কৃপায় খুব বেশি ক্ষতি হয় নি। এই সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কৃপায় আমরা নিজেদের ঈমানে অটল ছিলাম আর জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। বিরোধীতার কারণে কখনই আমাদের মনে এই ধারণা উঁকি দেয় নি যে আহমদীয়াত গ্রহণ করার কারণে আমাদের উপর এই অত্যাচার হচ্ছে। বিরোধীতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের ঈমানও ততটাই দৃঢ় হয়েছে। শহরের মৌলবীরা দিন রাত আমাদের বিরুদ্ধে জলসা করতে ব্যস্ত ছিল। তারা লোকেদের আমাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছিল। ভারতে হওয়া সত্ত্বেও শহরের একটি বিরাট জনসংখ্যা মুসলিম ছিল। কিছু অংশ হিন্দুদের ছিল আর মুসলমান এলাকায় যতটা বিরোধীতা হওয়া সম্ভব ছিল তা হয়েছে। একরাতে বিরোধীরা আমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট জলসার আয়োজন করে। শহর জুড়ে লাউড স্পীকারে সাহায্যে জলসা শোনানোর ব্যবস্থা করা হয় আর তাতে অনেক উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখা হয়।

সেই রাতেই আমরা খবর পাই যে, বিরোধীরা আফযাল নামে এক আহমদীর বাড়িতে হামলা করেছে এবং তাকে প্রচন্ড মারধর করেছে। তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। এরপর সাহারামপুরে যতগুলি আহমদী পরিবার ছিল একে একে সবার উপর আক্রমণ হয়। পরের দিন জুমার পর বিরোধীরা আমাদের বাড়িতেও চড়াও হয়। হামলাকারীরা আমাদের বিরুদ্ধে নারা দিচ্ছিল। সেই সময় আমি বাড়িতে একা ছিলাম। আমি ছেলে মেয়েদেরকে বাড়ির পিছনের ঘরে লুকিয়ে দিই। আমার দেওয়রের বাড়িতে বিরোধীরা ঢুকে অনেক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করে। আমি একা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করি, পরাজয় স্বীকার করি নি। তারা অগ্নি সংযোগ করার উপক্রম করছিল, এমন সময় পুলিস এসে যায়। পুলিস এসে তাদের উপর লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানি গ্যাস প্রয়োগ করে। প্রচুর লোক ছিল, পুলিস তাদেরকে নিয়ন্ত্রনে আনতে পারছিল না। পুলিসও ভয় পাচ্ছিল । যাইহোক পুলিসরা পরামর্শ দেয় যে, আপনার কিছু দিনের জন্য এখান থেকে চলে যান। পরিস্থিতি এখন ভাল নয়। সেই রাতেই আমরা সাহারামপুর ছেড়ে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হই। এত সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও আমরা অবিচল ছিলাম।

অতএব যখন ঈমান ভাগ্যে জোটে আর তা যদি প্রকৃত ঈমান হয় তবে অবিচলতাও আসে। মহিলা ও ছোটদের অবিচলতা পুরুষদেরকেও উদ্যম জুগিয়েছে। এই মহিলা ও তার সন্তানসন্ততিরা যদি কাপুরুষতা প্রদর্শন করত তবে পুরুষ সদস্যরা উদ্বেগে পড়ত। তাই এসব লোকেরাও কোথাও বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু সেখানে থেকে বিরোধীতার মোকাবেলা করতে থেকেছেন আর খুব বেশি হলে কাদিয়ান চলে এসেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: গাম্বিয়ার আমির সাহেব লেখেন: এখানে নর্থ ব্যাঙ্ক রিজিওন-এর একটি গ্রামে সিস্টার তিদা নামে এক জন্মগত আহমদী মহিলা রয়েছেন যিনি এক নিষ্ঠাবান আহমদী পরিবারের সদস্যা। কিন্তু নিয়তি তাঁকে এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণের সামনে এনে দাঁড় করায় যখন এক অ-আহমদী যুবকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়ে যায়। তাঁর স্বামীর পরিবার ছিল ধর্মীয় গোড়াপন্থী। আফ্রিকার এই মানুষগুলো বড়ই কট্টর প্রকৃতির মুসলমান হয়ে থাকেন যারা মূলত উগ্র ধর্ম উন্মাদনার শিকার। তাঁর স্বামীর পরিবার থেকেই আবার মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করা হত। এর থেকে অনুমান করা যায় যে এরা জামাতেরও ঘোর বিরোধী ছিল। এই মহিলা এদের সকলের কাছে নিজের ঈমানকে গোপন রাখেন নি, বরং প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দিয়েছেন। সবসময় এভাবেই তিনি জামাতের অনুষ্ঠানাদিতেও অংশগ্রহণ করে এসেছেন যেভাবে পূর্বে জলসায় অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু তাঁর স্বামী বা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের পিছনে কখনও নামায পড়েন নি। তিনি বলেছেন, আমি আহমদী তাই তোমাদের পিছনে নামায পড়ব না। এইভাবে স্বামীর বিরাগভাজন হয়ে অত্যাচারিত হতে থেকেছেন, কিন্তু কখনও নিজের ঈমান নষ্ট হতে দেন নি, বরং তিনি আরও অবিচল থেকেছেন। নিজের সন্তান সন্ততিদেরকেও জামাতের সঙ্গে দৃঢ় ভাবে যুক্ত রেখেছেন। তাঁর ছেলেমেয়েরাও নিয়মিত মিশন হাউসে আসে এবং তরবীয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণ করে। যাইহোক স্বামী তাঁকে অত্যাচার করার পর দ্বিতীয় বিবাহ করে নেয় এবং নয় মাস পর্যন্ত প্রথম স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় রেখে চলে যায়। তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে নি। তাঁর বড় ভাই এবং জামাত কিছু সময় পর্যন্ত তাঁকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও অবিচলতার পরিচয় দিয়েছেন। সব সময় দোয়া করতে থেকেছেন এবং দৃঢ় ঈমান প্রদর্শন করেছেন। তাঁর স্বামীর পরিবারে প্রতিবেশীদেরকে একত্রিত করে একটি ধর্মীয় সভা করার রীতিও ছিল যেখানে কোন বড় ইমাম আমন্ত্রিত হত। অ-আহমদী ইমাম নিজের বক্তব্যের সময় বলছিল, আহমদীয়া মসজিদের যখনই কেউ নামায পড়তে যায়, তখন তাকে পচিশ ডালাসী দেওয়া হয়। ডালাসী হল গাম্বিয়ার মূদ্রার নাম। সেই সিস্টা তিদাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, এই ইমাম মিথ্যা কথা বলছে, কেননা, আমি নিজেও আহমদীয়া মসজিদে দীর্ঘকাল নামায পড়ে এসেছি আর কখনও এক ডালাসী অর্থও গ্রহণ করি নি। এই কথাটি ইমাম সাহেবকে লজ্জায় ফেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই কথা শুনে তাঁর পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশীরা তাঁকে মসজিদ থেকে বের করে দেয় এবং তাঁকে অনেক অত্যাচার করা হয়। যাইহোক আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যাকে তিনি ভালভাবে তরবীয়ত করেছেন। প্রত্যেকেরই জামাতের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসা রয়েছে। স্বল্প আয় সত্ত্বেও তিনি যথারীতি চাঁদা দেন। নিজের এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি চাঁদার তহরীকে অংশগ্রহণ করেন এবং তারা আদর্শ আহমদী সন্তান। তারা কুরআন করীমও পড়েছেন। এরাই হলেন ধর্মকে রক্ষাকারীনি ও বিশ্বস্ত মহিলা যারা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এবং সফল হবেন। এবং তারা আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কারাজিতেও ভুষিত হবেন। এঁরা ধর্মের বিষয়ে দুর্বলতা প্রদর্শন করেন না। দারিদ্রতা সত্ত্বেও আর্থিক ত্যাগ-স্বীকারের ক্ষেত্রে অগ্রণী থেকেছেন। প্রতিকূল অবস্থা, পরিবারের লোকজনদের বিরোধীতা সত্ত্বেও নিজের সন্তানদের উত্তম তরবীয়ত করেছেন, তাদেরকে আহমদীয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir